আলফঁস

দোদে-র গল্প

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

ও

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

মিত্রালয়

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

-আড়াই টাকা-

মিত্রালয় ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত এবং ৩০, ব্রজমিত্র লেন, বোস প্রেস হইতে
শ্রীমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ

প্রিয়বরেষু

পরিচায়িকা

আলফঁস দোদেকে এমিল জোলা নাম দিয়েছেন 'চার্মার' বা ঐন্দ্রজালিক। দোদের কলমে ছিলো ইন্দ্রজাল রচনা করবার বিচিত্র ঐশ্বর্য। সহজ কথা ও সাধারণ একটুকরো ঘটনাই উজ্জ্বল রঙে রসে তাঁর হাতে পরিপূর্ণ একটি শিল্প-রূপ গ্রহণ করে, শব্দমালা বিছিয়ে দেয় মধুর মায়াজাল। অন্য কোনো দিক থেকে দোদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লেখক থাকতে পারেন, কিন্তু এমন সৌন্দর্যবোধ ও সূক্ষ্ম মাধুর্য, ফুলের মতো এমন একটি সম্পূর্ণ বিকাশ আর কারও গল্পে দেখা যায় না। দোদে বিশিষ্ট এক নতুন ধরণের গল্পরাজ্যের স্রষ্টা। এক আশ্চর্য ক্ষমতাগুণে স্বল্প পরিসরেই ইনি সাধারণ একটি বিষয়কেই গল্পচিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কল্পনার আলোছায়া ও নিখুঁত শব্দমালার মিলনরূপের এই অখণ্ডতাই দোদের গল্পকে এতো সুন্দর ও সজীব ক'রে রাখে। গল্প নয়, গল্পের বর্ণনা ভঙ্গীটিই এঁর রচনার প্রাণ-সম্পদ। পাকা মণিকারের হাতে কারুকাজ করা মণিরত্নের মতোই এঁর গল্প। রচনাশৈলী আগাগোড়াই একেবারে নিখুঁত।

দোদের গল্প [illegible] ইন্দ্রজালে রঞ্জিত হ'লেও জীবনের সংগে নাড়ীর টানে বাঁধা। [illegible]র্ণ ভাবেই বাস্তবের সম্পর্কে সুন্দর। দোদের জীবনের ছোটোখাটো অভিজ্ঞতা, নিজের পরিবেশ, জীবনাঙ্গনে সম্মিলিত নরনারী, প্যারীজীবনের পটভূমিকা—এই সমস্ত কিছুই তাঁর গল্প সাহিত্যে তিনি জীবন্ত ক'রে সৃষ্টি করেছেন। স্মৃতি ও কল্পনার উপাদান তাঁর হাতে হ'য়ে উঠেছে সুকুমার শিল্প। এই গল্পের জগৎ জীবনসুন্দর জগৎ। তাঁর অধিকাংশ গল্পেরই পটভূমিকা গ্রাম্য জীবনের ছবি, অথবা

ফ্রাংকো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময়কার প্যারী। প্রথমোক্ত গল্পের বই "মিলের চিঠি" নামে সংগৃহীত ; অন্য বইটি "প্যারী শহরের বুকে।" এই সব গল্প এমন সজীব সুন্দর যে পড়ে মনে হয় এর সবই বুঝি দোদের নিজের জীবনের সত্যিকার ঘটনা।

দোদের গল্প বিচিত্র রসে উজ্জ্বল, বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গীতে সমৃদ্ধ। হাসি-কান্নার মধুর রসে কানায় কানায় ভরা। উজ্জ্বল হাসির সংগে কোমল বেদনার আবেদন তাঁর বহু গল্পে। তবে, তাঁর হাস্যরসে উচ্ছ্বাস নেই, কখনো তা অসংযতভাবে উছলে পড়ে না। এ হাসি বেদনার মায়ায় ঢাকা, ব্যথার আদরে মোলায়েম। এ করুণার হাসি, সহানুভূতির হাসি। বেদনা ও হাসির এই মিলন-দোলাই দোদের অধিকাংশ গল্পে সূক্ষ্ম মাধুর্যের মায়াজাল বিছিয়ে রেখেছে। পড়তে পড়তে কখনো ওষ্ঠে ফুটে ওঠে আল্‌গা হাসির রেখা, কখনো বা সূক্ষ্ম রংগরসে ওষ্ঠ দুটি বক্র হয়ে ওঠে একটু। রচনার এই আবেদন অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ থেকেই জন্ম নিতে পারে। দোদে এই জগতের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

দোদেকে সাধারণত ডিকেন্সের সংগে তুলনা করে বলা হয় "ফরাসী ডিকেন্স"। দুইয়ের উপন্যাসে সাদৃশ্যও বর্তমান। তবে দোদে নিজে ডিকেন্সের প্রভাব স্বীকার করেননি। দোদের ছোটো গল্প তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। বিষয়বস্তু, বর্ণনা ভঙ্গীর বৈচিত্র্য, ভাষার কারুকাজ, সবই তাঁর নিজের গড়া রাজ্য এবং এখানে তাঁর সমকক্ষ কেউ... উপন্যাস নয়, বিশেষ ক'রে এই ছোটো গল্পের জন্যেই তিনি পৃথিবীতে বিখ্যাত। অধিকাংশ বিজ্ঞ সমালোচকের অভিমত তাই।

তখনকার ফরাসী সাহিত্যকে সাধারণত দুর্নীতি দোষে দুষ্ট বলা হয়ে থাকে, কিন্তু দোদের গল্প তা থেকে সম্পূর্ণভাবেই মুক্ত।

একটা কথা লক্ষণীয় যে দোদের গল্প আকার ও প্রকার, এই দুদিক

থেকেই গল্পলুব্ধ সাধারণ পাঠকদের মনোরঞ্জন না করবারই কথা ; কারণ, শুধু ঘটনাই এঁর গল্পের মূল কথা নয়। এঁর গল্প বিশুদ্ধ রসাশ্রিত। "দোদের গল্প ফরাসী সাহিত্য ভাণ্ডারের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মণিরত্ন" ব'লে সাহিত্য-দরদীদের কাছে সর্বত্র সমাদৃত।

দোদের গল্পরাজ্যের নানা বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই নির্বাচন করেছি এবং অনুবাদকালে তাঁর বিশিষ্ট বর্ণনাভঙ্গীর সৌন্দর্য রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি। ফরাসী নামধামের কঠিন উচ্চারণ সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু প্রুফ-দেখার পরীক্ষায় দু' একটি ভ্রান্তি থেকে লজ্জার কারণ ঘটেছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'লো বেলিজেয়ার স্থলে, বেলেজিয়ার।

পরিশেষে সানন্দে উল্লেখ করছি, অনুবাদের কাজে সহযোগী হয়েছে আমারই ছোট ভাই অমিয় কুমার চক্রবর্তী। একটি স্কুলের ছাত্রের এই সাহিত্যানুরাগ আমি সমাদরে গ্রহণ করেছি। বইয়ের গল্পমালার মধ্যে তার নিজের অনূদিত গল্প হ'ল রাজকুমারের মৃত্যু, বুড়োবুড়ী, শেষপাঠ, শেমিয়োর মঙ্গল দেবতা, সোনার মাথাওয়ালা লোক, কর্নেই-র মিল ও ফাদার গোশের সঞ্জীবনী সুরা।

আশ্বিন, ১৩৫২
১০।১ চক্রবেড়িয়া রোড সাউথ,
কলিকাতা

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

আলফঁস দোদে

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রভাঁসের নীম গ্রামে এই লেখকের জন্ম—এক দরিদ্র পরিবারে। পারিবারিক অসচ্ছলতা ও অন্যান্য দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে কেটেছে তাঁর বেপরোয়া বাল্যজীবন। বাবা ছিলেন সাধারণ একজন রেশমের কারিগর, তাঁর স্বল্প আয়ে পরিবারের খরচ চালানো কষ্টকর হ'য়ে ওঠে। তাই অল্প বয়সেই লিঁয়-র ইস্কুল জীবন ছেড়ে দিয়ে দোদেকে নামতে হ'ল চাকরীর খোঁজে। ষোল বছর বয়সেই দক্ষিণ অঞ্চলের অ্যালেতে গিয়ে মাষ্টারী নেন; কিন্তু শিক্ষকজীবনের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রতে না পারায় অ্যালের সেই দিনগুলি ক্রমে তাঁর কাছে দুঃসহ হ'য়ে ওঠে এবং বছরখানেক পরেই চ'লে আসেন প্যারীতে। এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে দোদের সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। দোদের প্রথম প্রকাশিত বই একটি কবিতা সংগ্রহ। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দোদে ডিউক মেরীর সেক্রেটারী ছিলেন এবং এই কাজের অবসরে স্বকীয় রচনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে "মিলের চিঠি" প্রকাশিত হ'লে সাহিত্যমহলে এক মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সাহিত্যানুরাগী সকলেরই দোদের দিকে নজর পড়ে। বিখ্যাত রসসৃষ্টি "মিলের চিঠি" দোদের গ্রাম্যজীবনের করুণ স্মৃতিলিপি—হাসি-কান্নায় অনিন্দ্যসুন্দর। বিখ্যাত উপন্যাস সাফো। এমিল জোলা, ফ্লবার্ত, এদমন্দ, মিস্ত্রাল প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের সংগে দোদের সৌহার্দ ছিল। [illegible] স্ত্রী জুলিয়া অ্যালান্দও ছিলেন তৎকালীন জনপ্রিয় লেখিকা [illegible] স্তেন এই ছদ্মনামেই তিনি বিদেশের কাছে পরিচিত। দোদে[illegible] বিবাহিত জীবন বিশেষ সুখের ছিলো। প্রেমপ্রতিভার এমন মণিকাঞ্চনযোগ প্রকৃতপক্ষে অতি কম লোকেরই ভাগ্যে জোটে। শেষ বয়সে দোদের শরীর ভেঙে পড়ে, অনিদ্রা রোগে বিশেষ কষ্ট পান। মৃত্যু হয় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে।

—অমিয়কুমার চক্রবর্তী

গল্পমালা

বের্লিন অবরোধ

শাঁজেলিসের বীথিপথ ধরে আসছিলাম আমরা, ডাক্তার ভি—। প্যারীর গোলা-জর্জর দেয়াল, গুলি-বিক্ষত মেজে—এককথায় প্যারীস-দখলের ইতিহাসটাই তার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম। এতোয়াল প্রাসাদের কাছে পৌঁছুতেই ডাক্তার হঠাৎ থেমে পড়লেন এবং সুন্দর কয়েকটি বাড়ীর মধ্যের নির্দিষ্ট একটিকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন :

ঝুলবারান্দার উপরে ওই জানালা বন্ধ করা ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন? তখন আগষ্টের প্রথম—ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত সেই ভয়ানক ৭০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট। সাংঘাতিক এক মৃগী রুগী দেখতে ডাকা হ'ল আমাকে। রোগী হলেন স্বয়ং কর্ণেল ঝুভে—প্রথম সম্রাটের অধীনস্থ এক বর্মধারী যোদ্ধা। জাতীয়তার গর্বে মুগ্ধ ও অন্ধ এই বৃদ্ধ; তাই যুদ্ধের প্রারম্ভেই তিনি আবাস নিয়েছেন শাঁজেলিসে। কেন? ফরাসী সৈন্য-বাহিনীর বিজয়গর্বিত প্রত্যাবর্তন স্বচক্ষে দেখবার জন্য। হতভাগ্য বৃদ্ধ! টেবিল থেকে উঠে তিনি দাঁড়িয়েছেন এমন সময়েই পৌঁছুলো এসে ভিস্ সাঁবুর্গের পরাজয় সংবাদ। বিজ্ঞপ্তির নীচেই নেপোলিয়াঁর স্বাক্ষর দেখতে পেয়ে তিনি বজ্রাহত হয়ে পড়লেন।

এসে দেখলাম কার্পেটের উপর সম্পূর্ণ শায়িত তিনি; রক্ত-জমাট তার মুখ,—কেউ যেনো একটা গদার বাড়ি মেরেছে তাঁর মাথার উপরেই। দাঁড়ালে হবেন তিনি প্রকাণ্ড পুরুষ,—শায়িত অবস্থায়ও বিরাট তাঁর দেহ। সুগঠিত দেহ-সৌষ্ঠব, চমৎকার দন্তপংক্তি, মাথায়

কোকড়ানো সাদা চুলের বাহার! বয়স আশীর মত হলেও দেখতে ষাটের বেশী নয়। তাঁর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে তাঁর নাতিনী। ঠাকুর্দার সংগে মেয়েটির এতো সাদৃশ্য যে তাদের মনে হবে একই হাতে গড়া দুটি মর্মর-মূর্তি। তবে একজন বৃদ্ধ,—তার শুষ্ক অংগপ্রত্যংগ শিথিল; কিন্তু অন্যটির দেহশ্রী দীপ্তোজ্জ্বল, তনুরেখা নিখুঁত সুন্দর—নতুন ভালোবাসার মতোই উজ্জ্বল কোমল!

এই মেয়েটির মর্মান্তিক দুঃখ আমার বুকেও আঘাত হানলো। সৈনিকের কন্যা সে, সৈনিকের নাতিনী; তার বাবা আছেন যুদ্ধে—ম্যাকমহঁের হেডকোয়ার্টারে। আর এদিকে ঠাকুর্দার অবস্থাও কী ভয়ানক। পুরো তিনদিন তিনরাত্রি কর্ণেল পড়ে রইলেন নিস্পন্দ নিশ্চল, বিমূঢ়-অচেতন। এমনি অবস্থার মধ্যেই প্যারীতে এসে পৌঁছুলো রাইখ্‌স্‌হোফ্‌নের বার্তা এবং আপনারা সবই জানেন সে কী বিচিত্র ভাবেই! সন্ধ্যা পর্যন্তও আমাদের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ছিলো—বড়ো রকম একটা যুদ্ধেই জয়ী হয়েছি আমরা: জার্মাণ মরেছে বিশ হাজার, যুবরাজ হয়েছেন বন্দী! কেমন করে জানি না, সে কোন দৈবপ্রেরণায়—কোন বিদ্যুৎ প্রবাহে এই জাতীয়-আনন্দের প্রতিধ্বনি জেগে উঠলো মূক বধিরদের প্রাণেও,—এমন কি পক্ষাঘাত-গ্রস্তদের অংগ প্রত্যংগে পর্যন্ত! সত্যিই, সেদিন রোগীর বিছানায় এসে দেখলাম তাঁকে আর এক মানুষ। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর চোখ,, জিভের আড়ষ্টতাও কেটে গেছে অনেকটা। এমন কি একটু হেসে হেসে দু'দুবার ভাঙা ভাঙা কথায় বললেনও—"জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।"

"হ্যাঁ কর্ণেল, মহান বিজয়!"

—ম্যাকমাহনের বিজয় বার্তা শোনাতে শোনাতে দেখলাম বেড়ে

উঠছে তাঁর দেহ, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখ। বাইরে এসে দেখি, তন্বী মেয়েটি আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে—ফ্যাকাশে মলিন; দোরের কাছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।

তার হাত দুটি ধরে আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম:

"উনি তো বেঁচেই উঠলেন এবার!"

বেচারা মেয়েটি তখন উত্তর জোগাবার মতো সাহসও হারিয়ে ফেলেছে। এই মাত্রই শহরের দেয়ালে দেয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে রাইথ্‌সহোফ্‌নের যথার্থ বিবরণ: মাকমাহঁ পলাতক, সমস্ত সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত! যুদ্ধরত বাবার কথা ভেবে ভেবে সে সহ্য করছিল দুঃসহ ব্যথা, এখন এই বৃদ্ধের কথা ভেবে তো শিউরেই উঠলাম আমি। এই ধাক্কা সে আর কিছুতেই সামলে উঠতে পারবে না—কক্ষনোই না। কিন্তু—আমরাই বা কি করতে পারি? থাক সে তার আনন্দে—জীবন-সঞ্জিবনী ঐ স্বপ্নসুন্দর রাজ্যে। তবে, তবে—মিছে কথা বলতে হবে।

"বেশ তাই বলবো আমি।"—সাহসিনী মেয়েটি তাড়াতাড়ি মুছে নিলো তার চোখের জল, হাসি মুখেই ফিরে এলো ঠাকুর্দার কাছে।

কী কঠিন এই কর্তব্য! প্রথম কয়েকটা দিন বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাকে। বৃদ্ধটির মস্তিষ্কও ছিলো দুর্বল,—সহজেই শিশুর মতো ভুলিয়ে রাখা হলো তাঁকে। কিন্তু স্বাস্থ্য ফিরে আসার সাথে সাথেই স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর চিন্তাধারা। সৈন্য বিভাগের গতিবিধির কথা জানাতে হয় তাঁকে, তৈরী রাখতে হয় নিত্য নতুন সামরিক বিজ্ঞপ্তি। সুন্দরী এই মেয়েটি দিনরাত সামরিক মানচিত্রের উপর উবুড় হ'য়ে ছোটো ছোটো পতাকায় চিহ্নিত করে রাখে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে, রচনা ক'রে রাখে গৌরবময় এক বিজয় অভিযান: বাজেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে

বেলিনের উপর, ফ্রাজার্ড ব্যাভেরিয়ায়, ম্যাকমোহন বাল্টিক অঞ্চলে! এই সব কিছুতেই মেয়েটি আমার সাহায্য চাইতো, আমিও সাহায্য এগিয়ে দিতাম সাধ্যমতো। কিন্তু, এই কাল্পনিক, অভিযানে আশ্চর্য রকম সাহায্য এগিয়ে দিয়েছে ঠাকুর্দা নিজেই। প্রথম সম্রাটের অধীনে তিনি নিজেই কতোবার যুদ্ধ করেছেন বেলিনে। যুদ্ধের সব গতিবিধি তাঁর নখাগ্রে—"হ্যাঁ, এবার যাবে তারা ঐখানে, গিয়ে এই সব করবে।" —এবং সাথে সাথেই তার ভবিষ্যদ্বাণী ফ'লে ওঠে নির্বিবাদে। বেশ গৌরব বোধ করেন তিনি।

কিন্তু বৃথাই আমরা দখল করছিলাম গ্রামের পর গ্রাম; এই বৃদ্ধের মানসিক গতিবেগের সাথে পাল্লা দিতে হেরেই যাচ্ছিলাম আমরা,—প্রত্যেকদিনই এসে শুনতাম তাঁর নতুন নতুন বিজয় বার্তা।

"ডাক্তারবাবু, এবারে জয় করেছি আমরা মাইআঁস্"—মেয়েটি আমার দিকে এগিয়ে বলতে থাকে, মুখে তার বুকভাঙা হাসি। সংগে সংগেই দরজার ওধার থেকে আসে সাদর আহ্বান—

"এগোচ্ছি আমরা, প্রবল বেগে এগোচ্ছি···এই হপ্তার মধ্যে পৌছুবো বেলিন।"

আর এদিকে ঠিক তখনি জার্মাণরা কিন্তু প্যারী থেকে এক সপ্তাহের পথও দূরে নেই······প্রথমে ভাবলাম, বৃদ্ধকে দেশে নিয়ে যাওয়া সমীচীন হবে কিনা; কিন্তু একবার বাইরে এসে পড়লেই ফ্রান্সের চারদিককার মর্মান্তিক অবস্থা খুলে দেবে তাঁর চোখ। তা ছাড়া আমার ধারণায় তখনো তিনি অত্যন্ত দুর্বল; তার সেই রুগ্ন অবস্থা নির্মম সত্যটা শুনবার পক্ষে অনুকূল নয়। কাজেই, এখানেই থাকবেন তিনি।

প্যারী আক্রমণের দিন এলাম তাঁর বাড়ীতে। প্যারীর দরজা

জানলা সব বন্ধ, ঘরে ঘরে যুদ্ধ, গ্রামের পর গ্রাম হয়ে উঠেছে যুদ্ধ-সীমান্ত। এসব খবরে কী রকম যে মর্মাহত হয়ে পড়ছিলাম—আজো মনে পড়ে তা। এসে দেখলাম গর্বে ও আনন্দে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে সেই বৃদ্ধ কর্ণেল।

"ডাক্তার"—তিনি বলছিলেন—"এবার সুরু হ'য়েছে বের্লিন অবরোধ, বেড়াজালে ঘিরে ধরবো ওদের।"

বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম আমি।

"এ কি বলছেন কর্ণেল, আপনি কি জানেন না যে—"

নাতিনীটি আমার দিকে ফিরে অমনি বলে উঠলো,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, মস্তো বড়ো সুখবর, আজই সুরু হলো বের্লিন অবরোধ!"—সেলাই থেকে ছুঁচটা আলগোছে তুলে নিয়ে মেয়েটি শান্তভাবেই বলে,—বৃদ্ধ কী করে আর অন্য কিছু সন্দেহ করে?

দুর্গ থেকে আসছে কামানের গর্জন। বৃদ্ধ তা শুনতে পাচ্ছেন না! ভাগ্যহত প্যারী, বিপন্ন বিপর্যস্ত প্যারী! কিন্তু এসব কিছুই তাঁর চোখে প'ড়ছে না। বিছানা থেকে দেখা যায় শুধু বাইরের একটুকরো দৃশ্য। তা'র ঘরে যেনো প্রথম সম্রাটেরই রাজত্ব, ভ্রান্ত স্বপ্নের উপযুক্তই সেই আবহাওয়া। সেখানে রয়েছে সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতিকৃতি, কতো যুদ্ধের ছবি, কতো মেডেল, শিশুবেশে রোম সম্রাট, চমৎকার এক তাম্রপাত্রে রাজকীয় চিহ্ন, ব্রঞ্জমূর্তি, সাঁ-হেলেনার পাথর, শেডের নীচে কয়েকটি ছোটো ছোটো প্রতিকৃতি। আসলে এই সব—এই সব সামরিক আবহাওয়াই সাহসী কর্ণেলের বুকে জাগিয়ে রেখেছে বের্লিন অবরোধের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। আমাদের কথা সেখানে গৌণ মাত্র।

সমস্ত যুদ্ধ প্রচেষ্টাই সেদিন থেকে বেশ সহজ হয়ে উঠলো আমাদের কাছে। বের্লিন-জয় এখন প্রতীক্ষার কথা মাত্র। বৃদ্ধটি মাঝে মাঝে

অধীর হয়ে ওঠেন, আর তখনই তাঁর ছেলের নামের একটা চিঠি পড়িয়ে শোনানো হয়,—কল্পিত চিঠি! তখন অবশ্যি বাইরে থেকে প্যারীতে কোনো চিঠি এসে পৌঁছানোও অসম্ভব, মাকমাহনের সেনাধ্যক্ষ সিদানও জার্মাণ দুর্গে বন্দী। একবার ভাবুন এই মেয়েটির দশা! কোনো খবর নেই তার বাবার—বন্দী সে, অসম্ভব যন্ত্রণায় জর্জরিত,—হয়তো পীড়িত সে; অথচ তখনো তাকে পড়ে শোনাতে হয় তার বাবার খুসীর জবানী। ছোট্ট চিঠি—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আশা করা যায় যেমন: বিজিত দেশের মধ্যে তারা এগিয়ে যাচ্ছে সোজা। মাঝে মাঝে আর পারে না সে,—বিনা খবরেই কেটে যায় দু'এক সপ্তাহ।

এদিকে অধীর ও অস্থির হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ, ঘুমুতে পারেন না। সংগে সংগেই চিঠি আসে জার্মাণী থেকে, মেয়েটি বিছানার পাশে বসে খুসীভরে পড়ে শোনায়, উদ্গত অশ্রু চেপে রাখে সে প্রাণপণে। শান্ত পবিত্র-ভাবেই শুনতে থাকেন কর্ণেল, হাসেন বিজ্ঞের মতো, সমর্থন করেন কোনোটা, সমালোচনা করেন এবং দুরূহ জায়গাগুলির সহজ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন আমাদের। ছেলের কাছে তাঁর উত্তরের একটা অংশ সত্যিই চমৎকার!

"প্রাণ থাকতেও ভুলবে না—তুমি ফরাসী সন্তান; সহৃদয় হবে অসহায় অধিবাসীদের প্রতি; তোমাদের বিজয় যেনো তাদের উপর ব্যভিচার না হ'য়ে ওঠে।" তারপরই বহু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, অনেক উপদেশ, ভদ্রতা ও ন্যায় আচরণ বিষয়ে সবিশেষ বক্তৃতা, নারীদের উপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শন, তাদের সংগে বিশিষ্ট ব্যবহার—এক কথায় বিজয়ী পক্ষের কর্তব্যসূচক দীর্ঘ এক নীতি-লিপি। রাজনীতি প্রসংগে মোটা মোটা মোটা দু একটা বক্তব্য—এবং বিজিতদের উপরে কি

রকম সর্ত প্রয়োগ করা উচিত—তাও। এই বিষয়ে তাঁর সমস্ত কথাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

"যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ চাই, আর কি? তাদের স্বদেশ, তাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে কী লাভ? জার্মাণীকে কি আর ফ্রান্স করা যায়?"

এই সমস্ত কথাই ছেলেকে লিখে পাঠাবার জন্য তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন। তাঁর সেই বিশ্বাস দীপ্ত কণ্ঠে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো এমন মুগ্ধ স্বদেশপ্রীতি যে তা শুনে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না।

এবং ঠিক সেই সময়েই অবরোধ সুরু হয়েছে—হায় ভগবান, বের্লিনের নয়, প্যারীর! তীব্র হিমে, বোমাবর্ষণে, সংক্রামক ব্যাধিতে, দুর্ভিক্ষে, হাহাকারে সমস্ত দেশের সে এক সর্ব্বনাশা দিন। কিন্তু আমাদের বিশিষ্ট যত্নে, ঐকান্তিক পরিশ্রমে, ও অফুরন্ত ক্ষমতা গুণে মুহূর্তের জন্যও ঠাকুর্দার মনের শান্তি নষ্ট হতে পারেনি। শেষদিন পর্যন্ত আমরা তাঁর খাবার প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছি পর্যাপ্ত মাখন, রুটি এবং গরম গরম মাংস। তাঁর পক্ষে তাই প্রচুর! কী করুণ ঠাকুর্দার সেই স্বার্থপর ভোজন, কী করুণ, কী মর্মভেদী বেদনার! বৃদ্ধ তাঁর শয্যায় হাসিমুখে শায়িত; কাছেই নাতিনী—মনে মনে নিরন্তর দ্বন্দ্বের ফলে মুখখানি তার মলিন। হাতে ধরে সে ঠাকুর্দাকে খাওয়াচ্ছে—কতো সব নিষিদ্ধ সুখাদ্য! বাইরে গর্জে চলেছে তুহিন বায়ু। জানলার পাশ দিয়ে ঝাপটা মেরে ছুটে যাচ্ছে তুষার-ঘূর্ণী। বৃদ্ধ এদিকে নিজের গরম ঘরের মধ্যে বিশ্রামের তৃপ্তি ও আরামে তাজা হয়ে উঠেছেন। একে একে মনে পড়ছে তাঁর সেই উত্তর অভিযান—রাশিয়া থেকে সেই করুণ প্রত্যাবর্তন,—পথে পথে খাবার শুধু ঠাণ্ডা ও বাসি বিস্কুট আর ঘোড়ায় মাংস! কতো শতোবার আমাদের কাছে বলেছেন এই করুণ কাহিনী।

"বুঝলে খুকী, ঘোড়ার মাংস খেতে হতো, ঘোড়ার মাংস!"

খুকী বোঝে প্রাণপণেই—এই দুমাস ধরে আর কিছুই খেতে পায়নি সে! রোগী ক্রমেই সুস্থ হয়ে ওঠার সাথে সাথে আমাদের কর্তব্য হয়ে ওঠে কঠিনতর। তাঁর অংগ-প্রত্যংগের অসাড় অবশ অবস্থায় আমাদের কাজ সহজই ছিলো। কিন্তু এখন তিনি চম্‌কে উঠছেন—মেইয়্যা গেটের দিক থেকে ভয়ংকর তোপধ্বনিতে সজাগ হয়ে উঠছে তার কান! বাজেনের চরম বিজয় উপলক্ষে এই তোপধ্বনি, এই বলে আমরা বুঝিয়ে রাখলাম তাঁকে। একদিন জানলার কাছে তুলে আনা হ'লো তাঁর বিছানা। সেদিন স্মরণীয় বৃহস্পতিবার। বৃদ্ধ দেখতে পেলেন গ্রঁাদ আমের বীথিপথে সমবেত জাতীয়-রক্ষী-বাহিনী।

"ঐ সৈন্যরা ক'চ্ছে কি ওখানে?"—গলায় কৈফিয়ত চাইবার দাবী,—দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বিড়বিড় কচ্ছিলেন তিনি—"খারাপ, এসব খারাপ নিয়ম!"

ব্যাপারটা বেশীদূর এগোয়নি আর। তবে, আমরা বুঝলাম যে আরো সাবধান হতে হবে আমাদের। কিন্তু দুঃখের কথা, যথেষ্ট সাবধান ছিলাম না আমরা।

"কালই ঢুকছে শত্রুরা!"—মেয়েটি বলছিলো।

"আচ্ছা ঠাকুর্দার দোর কি খোলা ছিলো? গেছে কাল সন্ধ্যায়, তাঁর মুখে যেনো দেখেছি,—কেমন একটা থমথমে ভাব। হয়তো আমাদের কথাবার্তাই শুনে থাকবেন তিনি। আমরা অবশ্যি বলছিলাম জার্মাণীর কথা,—তিনি বুঝেছেন ফরাসীদের বিজয়ী প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ মাল্যভারে সজ্জিত হয়ে মাকমাহঁ ফিরছে ভেরীধ্বনি মুখরিত বীথিপথে, পাশেই বৃদ্ধের নিজের ছেলে; আর এদিকে তখন বৃদ্ধ পিতা পুরোপুরি সামরিক পোষাক পরে ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে

অভিবাদন কচ্ছেন সমরছিন্ন জাতীয় পতাকা—ঈগল চিহ্নিত বারুদ-কালো জাতীয় পতাকা !”

হায়রে বৃদ্ধ পিতা ! নিশ্চিতই ভেবেছেন তিনি ভয়ানক একটা উত্তেজনা থেকে বাঁচানোর জন্যই আমরা তাঁকে বিজয়ী প্রত্যাবর্তনের পাশে উপস্থিত হতে দিতে চাই নি ! বুদ্ধিমানের মতো কাউকে কিছু বললেন না তিনি। কিন্তু পরের দিন ? প্রুশিয়রা মেইয়্য গেট থেকে ভীরু বিস্ময়ে অগ্রসর হচ্ছিলো ত্যুইলেরির প্রশস্ত রাজপথে—তখন আলগোছে খুলে গেলো রাস্তার উপরের একটা জানলা। কর্ণেল নিজেই এসে দাঁড়িয়েছেন বারান্দায় ! মাথায় শিরস্ত্রাণ, পাশে ঝুলছে মস্ত বড়ো তলোয়ার,—বর্মধারী কর্ণেলের সৈন্যবেশ ! আজো ভাবতে বিস্ময় লাগে—কী বিপুল মানসিক বল—নতুন প্রাণের কোন্ উত্তেজনা এমন করে তাঁকে খাড়া করে রেখেছে—এমন যুদ্ধ বেশে ! সত্যিই তিনি রেলিংএর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন বিস্মিত বিমূঢ়ের মতো,—দীর্ঘ বীথিপথ কোনো এতো নিস্তব্ধ নির্জন ? ঘরে ঘরে জানলা বন্ধ ! হাঁসপাতালের মতো স্তব্ধ বিষণ্ণ প্যারী !

উড়ছে বিজয় পতাকা,—কিন্তু একি ! শাদা পতাকার উপর আড়াআড়ি টানা লাল ক্রুশচিহ্ন ! আমাদের সেনাদলের সামনে ছুটছে কৈ প্রদীপ্ত জনতা !

এক পলক হয় তো ভেবেছেন তিনি,—তার নিজেরি ভুল—কিন্তু না। ঐ দূর পার্কের পেছনে ও কিসের শব্দ ? উজ্জ্বল আলোতে রাস্তা কাঁপিয়ে মার্চ করে আসছে দীর্ঘ এক কালো শ্রেণী…দেখতে দেখতে ঝলসে উঠলো তাদের শিরস্ত্রাণ, বেজে উঠলো দামামা, অস্ত্রের ঝণ্ ঝণা, আর তালে তালে সে কি উদ্ধত পদধ্বনি ! শূবর্ট-চালিত শত্রু-বাহিনীর আকস্মিক বিজয়-অভিযান !

তখন হঠাৎ সেই বিষণ্ণ-স্তব্ধতার বুক ফেটে বেরুলো তীব্র এক ভীষণ আর্তনাদ ঃ

"যুদ্ধ, যুদ্ধ—শত্রু, শত্রু প্রুশীয় !"

চারটি অগ্রগামী শত্রুসৈন্য অশ্বপৃষ্ঠ থেকে দেখতে পেলো এক বৃদ্ধ কম্পিত দেহে হাত নাড়তে নাড়তে হঠাৎ পড়ে গেলো—নিস্পন্দ নিশ্চল !

এবার সত্যি সত্যিই মৃত্যু হলো কর্ণেলের।

গোয়েন্দা বালক

নাম তার স্তেন,—ছোট্ট স্তেন। প্যারীর ছেলে, রোগা ফ্যাকাশে! চেহারা দেখে বয়স বলা শক্ত, দশও হ'তে পারে, আবার পনেরো হওয়াও অসম্ভব নয়। দুষ্টু ছেলেদের সংগে কেবল ঘুরে ফিরে বেড়ায়। মা নেই,—বাবা যুদ্ধ করতে করতেই বুড়ো হ'য়ে এসেছেন। গির্জা সংলগ্ন পার্কটি তত্ত্বাবধানের ভার এই বৃদ্ধের উপরেই। এই মার্বেল বাঁধানো ফুলের দেশে বেড়াতে আসে কতো শিশু, ধাত্রী ও মায়েরা, এমন কি ঠেলা গাড়ীতে বুড়ীরাও। এক কথায় ভ্রমন-চঞ্চল প্যারীর সবাই। আর, সবাই চেনে এই বুড়ো স্তেনকে,—ছোট্ট স্তেনের বাবাকে। শুধু চেনে নয়,—শ্রদ্ধা করে তাঁকে। তারা জানে, বৃদ্ধের ভয়ংকর উদ্ধত গোঁফ জোড়ার আড়ালেই লুকিয়ে আছে সহৃদয় একটি হাসি,—অনেকটা মায়ের দরদ মাখা হাসির মতোই। আর এই হাসিটুকু দেখতে চাও তো বৃদ্ধকে একটিবার মাত্র বললেই হবে— "ঠাকুর্দা, আপনার ছেলে ভালো আছে তো?" বুড়ো স্তেন এতো ভালোবাসে তাঁর ছেলেকে! স্কুল ছুটির পরে বিকেলে ছোট্ট স্তেন বাড়ী ফিরে এলে বুড়োর প্রাণ ভরে উঠে; দুজনে মিলে তখন বেড়াতে যায়, কতো চেনা লোকের সংগে পথে পথে হয় নমস্কার বিনিময়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতো আলাপ অভ্যর্থনা।

কিন্তু জার্মাণদের আক্রমণের সংগে সংগে সবি বদ্‌লে গেছে আজ! পার্কটির দরজা বন্ধ,—সেখানে মজুত হ'য়েছে পেট্রোল, সাফ করে ফেলা হ'য়েছে গাছপালা। বুড়ো সব সময়ই পাহারায় থাকেন এখানে,—

এই নির্জন বনভূমিতে দিনগুলি কেটে যায় নিঃসংগ একেলা। রাতের আগে খেতেও যান না,—তাই ছেলের সাথেও তাঁর আগে আর দেখা হয় না। জার্মাণদের কথা বলার সময় তাঁর মস্তো গোঁফ জোড়া হয়ে উঠে সত্যিই দেখবার মতো। ছোট্ট স্তেন কিন্তু ভাবে,—নতুন এই জীবন ধারার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কী আছে এমন ?

অবরোধ! অবরোধ! দুষ্টু ছেলেদের কাছে সে তো বরং মজার! স্কুল যাওয়ার নাম নেই, পরীক্ষার পড়া নেই, ছুটি, ছুটি, সব সময়ই ছুটি! রাস্তায় রাস্তায় শুধু খুসীর খেলা!

ছেলেটি সন্ধ্যে অবধি বাইরেই কাটিয়ে দেয় ঘুরে ফিরে। সৈন্যদলের সংগে সে এগিয়ে যায় কুচকাওয়াজে; ব্যাণ্ডওয়ালা দলগুলিই সব চেয়ে ভালো লাগে তার,—আর এদিকে তার কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! হলফ করে সে তোমাকে বলতে পারে,—অষ্টাদশ-বাহিনী কোনোই কাজের নয়, কিন্তু হ্যাঁ,—পঞ্চাশ নম্বর বাহিনীতে আছে একজন মানুষের মত মানুষ! কখনো কখনো সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে রিজার্ভ-বাহিনীর কুচকাওয়াজ! তারপর, তাদের সেই সারি বেঁধে দাঁড়ানো…

শীতের উজ্জ্বল সকালে রুটিওয়ালা ও কশাইর দোকানের সামনে সারি বেঁধে যায়,—সেও তারি সংগে এসে দাঁড়ায়, হাতে একটা ঝুরি! সেখানে নর্দমার কাদার মধ্যে পা ডুবিয়ে চলে কতো আলাপ পরিচয়,—রাজনীতি সমালোচনা, যুদ্ধের কথা। বৃদ্ধ স্তেনের ছেলে বলেই ছোট্ট স্তেনের মতামতটা জানতে চায় সবাই। কিন্তু সবচেয়ে মজার হলো বাজি রেখে তাস খেলা। অবরোধ কালে ব্রিটনের রিজার্ভ-বাহিনী এটাকেই করে তুলেছিলো মজার খেলা। কুচ কাওয়াজে বা রুটিওয়ালার ওখানে না পেলে ছোট্ট স্তেনকে নিশ্চয়ই তুমি খুঁজে পাবে এই খেলার জায়গায়। সে খেলে না অবশ্যি, তাতে যে অনেক

টাকার দরকার! চোখে দেখেই খুসী থাকে। বিশেষ করে একটি লোককে দেখে সে আশ্চর্য হ'য়ে যায়!

এক টাকার কম সে ধরে না একবারও। নীল কোট পরা মস্তো চেহারা তার,—দৌড়োলে ঝনঝন শব্দ হতে থাকে পকেটে। একদিন তার একটা টাকা গড়িয়ে পড়লো স্তেনের পায়ের কাছেই। টাকাটা তুলতে তুলতে সেই লম্বা লোকটা ফিস্ ফিস্ করে বললো—"এ দেখে লোভ হচ্ছে তোমার? তা, ইচ্ছে করলে তুমিও পেতে পারো।"

খেলার পরে স্তেনকে সে পার্কের এক কোণে এনে বললো—"জার্মাণদের কাছে পত্রিকা বিক্রী করতে হবে, প্রতি বারে দেবে তারা দশ টাকা।" স্তেন কিন্তু রেগে উঠে সংগে সংগেই প্রত্যাখান করলো এই প্রস্তাব। তিনদিনের আগে এই ধাক্কা সে সামলাতেই পারে না,—ভুলেও পা বাড়ায় না খেলার ওদিকে। ভয়ংকর তিনটি দিন,—খাওয়া নেই, ঘুম নেই। রাতে সে স্বপ্ন দেখলো,—তার বিছানার পাশে মস্তো খেলার আয়োজন, মেজেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে কতো ঝলমলে টাকা! এতো বড়ে লোভ সামলে থাকা তার পক্ষে শক্ত। চতুর্থ দিনে খেলার জায়গায় ফিরে গেলে দেখা হ'লো সেই লোকটার সংগে এবং তার হাতেই সে নিজেকে ছেড়ে দিলো......

ভোর, বাইরে তুষার পড়ছে। এক সংগেই রওনা হলো তারা। পিঠের উপর বস্তা, পত্রিকাগুলি লুকানো জামার নীচে। যখন তারা গ্রামসীমান্তে গিয়ে পড়লো সূর্য তখনো উপরে ওঠেনি। সেই লোকটি স্তেনের হাত ধরে এগিয়ে গেলো পাহারাওয়ালার কাছে; পাহারাওয়ালাটি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো,—বেশ দয়ালু মানুষের মতোই তার মুখখানা। এর কাছে এগিয়ে সেই লোকটি হঠাৎ দুঃখের কান্না জুড়ে দিলো:

"আমাদের ছেড়ে দাও দয়া ক'রে···মা অসুখে প'ড়ে, বাবা মারা গেছে। আমার এই ছোট্ট ভাইকে নিয়ে মাঠে যাচ্ছি—আলু খুঁজতে!" সত্যি সত্যি কাঁদছিলো সে! লজ্জায় স্তেনের মাথা নুয়ে পড়ে। পাহারাওয়ালাটি দুজনকেই নজর করে দেখে, দেখে তুষারশাদা নির্জন রাস্তাটা। "যাও, যাও জলদি!"—এদের সে ছেড়ে দেয়। এবারে চলালো তারা ওবেয়ার্‌ভিলিয়র্‌ গাঁয়ের পথ ধ'রে। ওঃ তখন কী রকম হাসছিলো সেই লোকটা!

বিমূঢ়ের মতো স্তেন দেখছিলো শুধু: কতো কলকারখানা হয়ে গেছে সৈন্য-নিবাস, ভেঙে পড়েছে কতো প্রাচীর, ভাঙা চিম্‌নিগুলি উঁচিয়ে আছে আকাশে,—চারদিকের কুয়াশার মাঝখানে সে যেনো কতোগুলি গভীর গর্ত! ক্বচিৎ কোথাও দু'একটি পাহারাওয়ালা! অফিসার যোদ্ধারা দূরবীণ হাতে নজর ক'রে দেখছেন দূরের দিকটা,—কোথাও বা নিভু নিভু আগুনের পাশে ছোটো ছোটো তাঁবু, গলে পড়ছে তুষার। সব পথই এই লোকটার নখাগ্রে! গ্রাম্য পথ ধরে সে যাচ্ছিলো কাঠের পাঁচিল ঘেরা একটা জায়গার দিকে। কিন্তু, হঠাৎ কেমন ক'রে যেনো তারা এসে পড়লো গুপ্ত একটি ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীর মধ্যে। সবাই গা ঢাকা দিয়ে অবস্থান করছিলো মস্তো একটা জলভরা পরিখায়। পরিখাটা চলেছে একটা রেল লাইনের পাশে পাশে। এবারে সেই লোকটিকে বোধ হয় নতুন ক'রে আবারো জুড়তে হবে তার মায়া-কান্না,—নইলে কি এরা ছেড়ে দেবে?

কান্নাকাটি শুনে রেল-লাইন-ক্রসিং রক্ষকের ঘর থেকে পরিখার কাছে এলেন এক বৃদ্ধ সার্জেন্ট, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে তার, দেখতে ঠিক বুড়ো স্তেনের মতোই।

"এই যে ছেলেরা,—কান্নাকাটি ক'রো না।"—ব'ললেন তিনি—

"আলুর খোঁজে যেতে পাবে এখনি। তার আগে ভেতরে এসে একটু গরম হ'য়ে নাও। ইস্, এই ছোট্ট ছেলেটি একেবারে জমে গেছে যে!"

ঠাণ্ডায় কাঁপছে না স্তেন,—কাঁপছে ভয়ে……লজ্জায়……! গার্ডরুমে কয়েকটি সৈন্য আগুনের পাশে ব'সে গা গরম ক'রে নিচ্ছিলো, আর বেয়নেটের মাথায় রুটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে সেঁকে নিচ্ছিলো। ঘেষাঘেষি ক'রে ব'সে তারা ছেলেদের জায়গা ক'রে দিলো,—ছোটো ছেলেদের কিছুটা গরম কফি খেতে দেওয়া হ'লো। তখন একজন অফিসার দোরের কাছে এসে সার্জেণ্টকে ডেকে চুপি চুপি কি ব'লে চ'লে গেলেন। অমনি উজ্বল হ'য়ে উঠলো সার্জেণ্টের সারা মুখ,—"এই ছেলেরা, আজ রাতে আমোদ হবে আমাদের। জার্মাণদের গোপন খবর জানা গেছে সব……এবারে আমাদের সুন্দর বুঝে আবার দখল ক'রবো আমরা।"

চার দিকেই তখন সে কি উল্লাস-ধ্বনি। নাচ, গান, আর তারি সাথে সাথে বেয়নেটে শান দেওয়া। ইতিমধ্যে ছেলেরাও স'রে পড়েছে যে যার কাজে।

পরিখার ওপারেই প্রান্তর,—তারি প্রান্তে একটা প্রাচীর, গোলা গুলিতে বিক্ষত। দুজনে এগিয়ে চললো সেদিকেই, বার বার নুয়ে প'ড়ে আলু কুড়োবার ভান ক'রে।

"আর যাবো না, ফিরে যাবো আমি, আর যাবো না!"—ছোট্ট স্তেন বলে শুধু।

সংগীটি কিন্তু ঘাড় কুঁচকে সোজা চলতেই থাকে। হঠাৎ রাইফেলের শব্দ!

"শুয়ে পড়ো, শুয়ে।"—লোকটা মাটির উপর শুয়ে পড়ে। আর

শিস্ দিতে থাকে জোরে,—তুষারের ওপার থেকেও শিস্ দেওয়ার শব্দ আসে। চার হাত পায়ে এগোচ্ছে তারা। দেয়ালটার সামনে মাটির মধ্য দিয়ে জেগে আছে একটা টুপি ও প্রকাণ্ড এক জোড়া হলদে গোঁফ। স্তেনের সংগী অমনি সেই পরিখার মধ্যে মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ে—জার্মাণটির পাশেই। "এ আমার ছোটো ভাই!"—স্তেনকে দেখিয়ে দেয় সে।

স্তেন,—স্তেন এতো ছোট যে জার্মাণটা তাকে দেখেই হেসে উঠে, তাকে দু' হাতে তুলে ধরে উপরে।

দেয়ালের ওপারে মস্তো বড়ো মাটির বাঁধ, মাটির উপর শোয়ানো বড়ো বড়ো গাছ, তুষার প্রান্তরে কালো কালো গর্ত,—আর প্রত্যেক গর্তেই সেই কাদামাখা টুপি আর হলদে গোঁফ! শিশুদের দেখে দেখে তারা সবাই হেসে উঠছিলো।

এটা এক মালীর বাড়ী, গাছের গুঁড়ি দিয়ে চারদিকই সুরক্ষিত। নীচ তলায় অনেক সৈন্য মিলে তাস খেলছে, ঝোল তৈরী হচ্ছে মস্তো বড়ো উনুনে। বাঁধা কপি আর মাংসের সুগন্ধি ভেসে আসছে। সেই ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীর চেয়ে কতো ভালো। দোতলায় অফিসার দল। কেমন পিয়ানো বাজছে, তার সাথে সাথে শ্যাম্পেন বোতলের ছিপি খোলার মিষ্টি আওয়াজ! প্যারীর এই শিশুরা ঘরে এসে ঢুকলেই সবাই তাদের অভ্যর্থনা করে উল্লাস ধ্বনিতে! আর তারাও অমনি লুকিয়ে আনা পত্রিকাগুলি বের করে দেয়। ছেলেদের সামনেও দেওয়া হয় খাবার। তাদের মাঝেও হয় আলাপ আলোচনা। অফিসারদের তখন দেখায় কেমন গর্বিত, কেমন যেনো ধূর্ত!

স্তেনের সংগীটি তার নোংরা তামাসা আর অভদ্র ভাষা দিয়ে জমিয়ে রাখছিলো সবাইকে,—আর তারাও হাসতে হাসতে তার

কথাই পুনরাবৃত্তি করতে করতে খুশীতে গড়িয়ে পড়ছিলো মাটির উপর,—প্যারীর মাটির উপর! ছোট্ট স্তেনের কথা বলতে ভারী ইচ্ছে হচ্ছিলো,—দেখাতে চায় যে বোবা নয় সে, কিন্তু কোনো কারণে দমে যায়। তারি সামনে ব'সে ছিলো একজন জার্মাণ, অন্যের চেয়ে আলাদা সে, সকলের চেয়ে বৃদ্ধ এবং গম্ভীর। বই পড়ছিলো সে অথবা পড়ার ভাণ করছিলো শুধু,—কারণ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্তেনের উপরেই। তার সেই দৃষ্টিতে ফুটে আছে স্নেহ ও ভর্ৎসনা। যেনো নিজের দেশেই আছে তার স্তেনের মতো ছোট্ট এক ছেলে! কেননা সে নিজের মনে বলছিলো—

"নিজের ছেলেকে এমন নীচ ব্যবসায় ধরতে দেখার চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো!"·········

আর, সেই মুহূর্ত থেকেই স্তেনের প্রাণটাকে কে যেনো থাবা দিয়ে চেপে ধরলো, বুকের স্পন্দনও থেমে যাবে বুঝি!

অদ্ভুত এই অনুভূতি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই সবাইর সংগে সেও মদ খেতে লাগলো এবং সব কিছুই একে একে ঘোলাটে হয়ে এলো। হৈ হল্লার মাঝেই অস্পষ্টভাবে সে যেনো শুনছিলো:

সংগীটি ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে ঠাট্টা ক'রছে,—ভেঙ্‌চি কাটছে, তার নিজের দেশবাসীর সমর আয়োজনের উপর বিদ্রূপ কচ্ছে খুব! তারপর সেই লোকটা গলার স্বর নামিয়ে আনলো এবং অফিসারেরাও অমনি ঝুঁকে পড়লো তার দিকে,—গম্ভীর হয়ে উঠলো তাদের মুখ। এই হতভাগা ফরাসী সন্তান গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের কথাই জানিয়ে দিচ্ছে জার্মাণদের······

ছোট্ট স্তেন রাগের মাথায় লাফিয়ে ওঠে—এবারে সে জেগে উঠেছে তার নেশার রাজ্য থেকে:

"না, না, তোমাকে—তোমাকে আমি……কক্ষনো, না, না কক্ষনো না—"

লোকটি কিন্তু হাসতে হাসতেই বলে যায়। তার কথা শেষ হতে না হতেই উঠে পড়ে সব অফিসারেরা, একজন দরজা দিয়ে ছেলেদের তক্ষুনি সরিয়ে দেয় বাইরে।

"বাইরে, বাইরে এবার।"—দ্রুত জার্মাণ ভাষায় এবারে সুরু হয় তাদের নিজেদের ভেতরকার আলাপ আলোচনা। মস্তো লোকটি বাইরে এলো, হাতে টাকা বাজাতে বাজাতে গর্বভরে উঁচু হয়ে ওঠে সে। পিছু পিছু আসে স্তেন, মাথা তার নীচু হয়ে গেছে ; সেই বৃদ্ধ জার্মাণটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই সে ভয়ানক পীড়িত হ'য়ে উঠছিলো। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় স্তেন যেনো শুনতে পেলো তার ব্যথাতুর কণ্ঠ,—"তুমিও !"

দু চোখ তার অশ্রুতে ভ'রে ওঠে।

প্রান্তরে নেমে এসে ছেলেরা আবার ছুটতে সুরু করলো,—শিগগিরি তারা ফিরে এলো এপারে। পিঠের উপরে বস্তাভরা আলু,—জার্মাণদের দেওয়া আলু! ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনী সহজেই পেরিয়ে এলো তারা। সেই রাতেই জার্মাণদের আক্রমণ করার জন্য এরা তৈরী হয়ে নিচ্ছিলো, সৈন্যদল একে একে জড়ো হচ্ছিলো পরিখার পেছনে। সেই সহৃদয় বুড়ো সার্জেণ্টটিও এখানেই,—সে তার অধীনস্থ সৈন্যদলের অবস্থান স্থির ক'রে দিচ্ছিলো। বুড়ো আজ বেশ হাসি-খুসী। ছেলেরা তার পাশ দিয়ে চলে যেতেই সে চিনতে পেরে তাদের দিকে চেয়ে একবার হাসলো। প্রাণখোলা মিষ্টি হাসি! সেই হাসি কিন্তু চাবুকের মতোই এসে পড়ে ছোট্ট স্তেনের উপর। তার মনে হ'লো, এক্ষুণি সে চীৎকার করে উঠবে—"না, না তোমরা যেওনা ওদিকে…আমরা বলে দিয়েছি সব—বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছি।" কিন্তু তার সংগী তাকে

আগেই জানিয়ে দিয়েছে—"কোনো কথা বে ফাঁস করো তো গুলি করে দেবো।" তাই ভয়ে তার মুখে কথা ফোটে না।

এবারে দুজনে এসে ঢুকলো একটা ছাড়া-ঘরে,—টাকা ভাগাভাগির জন্য। ভাগটা অবিশ্যি নিয়ম মতোই হ'লো। জামার নীচে টাকার ঝনঝনানি শুনে,—আর খেলার কথা মনে পড়তেই স্তেনের কাছে ব্যাপারটা আর ততো ঘৃণ্য মনে হলো না।

কিন্তু,—আবার একা চ'লতেই তার দশা বড়ো করুণ হ'য়ে ওঠে। প্যারী সীমান্তে ঢোকার আগেই সেই লোকটা চলে গেছে। ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে স্তেনের পকেট,—আর সেই থাবাটা যেনো আরো সজোরে চেপে ধরেছে তার প্রাণটাকে। প্যারী যেনো তার কাছে আর সেই সেই প্রিয় পরিচিত প্যারী নয়। প্রত্যেকটি পথিকই তার দিকে চেয়ে আছে কঠিন দৃষ্টিতে। সবাই যেনো জানে—কোত্থেকে এসেছে সে,—কী নীচ কাজ ক'রেছে সে। গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর-ধ্বনি তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ব'লছে—"গোয়েন্দা, ঐ যে গোয়েন্দা!" পরিখার পাশের ব্যাঙবাজনা সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে—"গোয়েন্দা, ঐ যাচ্ছে একটি গোয়েন্দা।" বাড়ী পৌঁছুলো স্তেন। বাবা বাড়ী আসেননি এখনো,—তবু ভালো! তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে সে বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখলো টাকা কটা! ওগুলি যেনো জগদ্দল পাষাণের মতোই তাকে চেপে ধরেছিলো। সে দিনের সন্ধ্যার মতো এমন খুশীতে—এমন সহৃদয় হাসি মুখে বুড়ো স্তেন আর কোনো দিনই বাড়ী ফেরেননি। এই মাত্রই খবর পেয়েছে সে—পল্লী অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা খুবই সন্তোষজনক। খেতে খেতে বুড়ো একবার দেয়ালে ঝুলোনো বন্দুকটার দিকে, একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে খুশীতে হেসে উঠেন। "বড়ো হ'য়ে জার্মাণ ব্যাটাদের খুব শিক্ষা দিয়ে দিবি,—কেমন?"

রাত আটটার সময় হঠাৎ গর্জে ওঠে কামান। "বুঝে'তে যুদ্ধ হ'চ্ছে এবার।" বুড়ো বললেন—সব দুর্গ, সব আশ্রয়ই তাঁর চেনা।

ছোট্ট স্তেন ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে ওঠে; শরীর খারাপের অছিলায় সে শুতে যায়,—কিন্তু ঘুমুতে পারে না। ওদিকে অনবরত সেই কামান গর্জন। মনে মনে ভাবছিলো সে—আমাদের এই গোলন্দাজ বাহিনী জার্মানদের আক্রমণ ক'রতে গেছে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কিন্তু ঘেরাও হ'য়ে ম'রছে নিজেরাই। পরিখার মধ্যে লুকিয়ে-থাকা সেই. জার্মান সৈন্যটিকে মনে পড়লো তার। তাকে ও অন্য সব ছেলেদের তুষারের উপর দিয়ে চার হাত পায়ে এগোতে দেখে কী রকম হাসছিলো সে।…ঐ সব ফরাসী সৈন্যদের প্রাণের দামই তো লুকোনো এইখানে,—এই বালিশের নীচেই! অথচ সে নিজেই হ'লো মার্শাল স্তেনের ছেলে,—যোদ্ধার ছেলে।…ঠেলে-ওঠা কান্নায় গলা তার ধ'রে আসে। বাবা পায়চারি ক'চ্ছিলেন পাশের ঘরেই, খুলে দিয়েছেন জানলাটা। নীচের পার্কটায় ধ্বনিত হ'য়ে উঠছে সমর-আহ্বান। এক ডিভিসন রিজার্ভ বাহিনী যুদ্ধযাত্রার আয়োজনে সমবেত হ'চ্ছে। সত্যি সত্যি যুদ্ধ হ'চ্ছে তা হ'লে? ভয়ানক যুদ্ধ! বেচারা ছেলেটি এবার আর কান্না সামলে রাখতে পারে না।

"কি, কি হ'য়েছে খোকা?"—বুড়ো স্তেন ভেতরে আসে। ছেলেটি তখন আর ঠিক থাকতে পারছিলো না,—বিছানা থকে ছুটে এসে আছড়ে পড়লো সে বাবার পায়ের উপর; সংগে সংগেই টাকাটা মেজের উপরে প'ড়লো ঝনঝন করে। "এ কি, চুরি ক'রেছো তুমি?"—বৃদ্ধের সমস্ত দেহ কেঁপে ওঠে থর থর করে।

স্তেন এক নিশ্বাসেই বলে ফেললো সব—জার্মাণদের কাছে তার যাওয়ার কথা, সেখানে গিয়ে যা যা ক'রেছে—সব কিছু। বলতে বলতে বুকের

ভার হালকা হ'য়ে ওঠে, নিজের দোষ জানাতে পেরে প্রাণটা সহজ হ'য়ে এসেছে।···বৃদ্ধ স্তেন পাষাণ-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে শুনে যাচ্ছেন সব,—মুখ তার ভয়ংকর গম্ভীর। সব কথা বলা হ'লে ছেলেটি তার বাবার পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে থাকে শুধু।

"বাবা, বাবা······"—সে বলতে চাচ্ছিলো।

বৃদ্ধ নীরবে তার সমস্ত আহ্বান প্রত্যাখ্যান ক'রে টাকাটা কুড়িয়ে নিলেন।

"এই কি সবটা ?"—জিজ্ঞেস করেন তিনি।

স্টেন মাথা নেড়ে সায় দেয়। বৃদ্ধ তার বন্দুকটি নামিয়ে এনে কার্তুজ-বেল্টটা প'রলেন,—টাকাটা রাখলেন পকেটে।

"আচ্ছা বেশ!"—শেষ পর্যন্ত বললেন তিনি—"টাকাটা তাদের ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি।"

এবং আর একটি কথাও না বলে, এমন কি ছেলের দিকে একটি বারও না ফিরে সোজা বেরিয়ে গেলেন।

সেই রাতেই রিজার্ভ সৈন্যদল যুদ্ধে যাচ্ছিলো, সেই দলেই যোগ দিতে চ'ললেন তিনি।

আর কখনো কেউ তাকে দেখতে পায়নি!

বেলেজিয়ার-এর প্রুশীয় যোদ্ধা

কয়েকদিন আগেই গল্পটা শুনেছি মঁমার্ত্র্-এর এক সুরার দোকানে। তবে, গল্পটির উপরে সুবিচার ক'রতে হ'লে আমার থাকা চাই মাষ্টার বেলিজেয়ারের গ্রাম্য বর্ণনাভংগী, আর তার লম্বা পোষাক,—আর সাথে সাথে খাওয়া চাই দু'এক কাপ ক'রে মঁমার্ত্রে্র সুরা,—যার প্রসাদে ভার্য়েসাই মুখেও ফুটে ওঠে প্যারী ঢং। তবেই তো আমার কাহিনী শুনতে শুনতে ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে প'ড়বে সবাই, হিম হ'য়ে যাবে রক্ত। বেলিজেয়োর তার সংগীদের কাছে ঠিক তেমন ক'রেই বলতেন।

সম্‌বিইবার পরের দিন (বেলেশিয়ার ব'লতেন তাই) আমার স্ত্রী ব'ললো ছেলেটাকে সাথে নিয়ে ভিল্‌দ্ভ্‌লা-গারেন্‌-এ গিয়ে আমাদের সেখানকার ঘরবাড়ির খোঁজখবর নিতে,—অবরোধ সুরু হয়েছে থেকে সেখানকার কোনো খবরই পাওয়া যায়নি। বাচ্চাটাকে সংগে নিয়ে যেতে আমার ভয়ই হচ্ছিলো,—প্রুশীয়দের ভেতরে গিয়ে পড়ার ভয়! তখনো প্রুশীয়দের সংগে দেখা হয়নি ব'লে আমার আরও ভয় হচ্ছিলো। দেখা হ'লে নিশ্চয়ই একটা অশুভ ব্যাপার ঘটবে। কিন্তু ছেলের মা ঠিক নাছোড়বান্দা—"আঃ, বেরোও না একটু; ছেলেটা তাজা হাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচুক।"

আর সত্যি, এই পাঁচ মাস ধরে অবরোধ ও প্রতিরোধের পরে ছেলেটার একটু বাইরে যাওয়া একান্তই দরকার। বেচারার যা দশা! কাজেই মাঠের মধ্য দিয়ে রওনা হ'লাম দুজনে। বাচ্চাটা আবারো এই সব

গাছপালা ও পাখী দেখতে পেয়ে বেশ খুশীই হ'লো। চষা মাঠ ধ'রে যেতে যেতে সারা গায়ে কাদা মাখাতে ভারী মজা পাচ্ছিলো সে।

আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছিলো না। চারদিকেই চোখে প'ড়ছে অসংখ্য শিরস্ত্রাণ ; সামনের খালটা থেকে ঐ দূরের দ্বীপটা পর্যন্ত সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে তারা। আর তাদের সে কি উদ্ধত দৃষ্টি ! ওদের গায়ের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়ি সেজন্যে নিজেকে প্রাণপণ সামলে রাখতে চেষ্টা ক'রলাম। কিন্তু ভিল্‌হ্ভ্‌ পৌঁছুতে আমাদের বাগানের সেই ছন্নছাড়া দশা দেখেই তো মেজাজ গরম হ'য়ে উঠলো, চারা-গাছগুলি ওপড়ানো, ঘরগুলি ভাঙাচুরো, দোরগুলি খোলা—আর সেই প্রুশীয়রা,—সেই দস্যুদল আমাদেরি ঘরে ! তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে হাতটা নিষপিষ ক'রতে থাকলে মনে মনে ভাবি :

"বেলিজেয়ার ধৈর্য ধরো, শান্ত হও ; ছেলেটা রয়েছে সংগে, নিজ হাতে ওর সর্বনাশ ডেকে এনো না।"

শুধু এই জন্যই তখন কোনো দুষ্কর্ম ক'রে বসিনি। এতক্ষণে বুঝলাম ছেলের মা কেন জিদ ধরে ছেলেকে পাঠিয়েছে আমার সংগে।

খোলা মাঠের প্রান্তে আমাদের কুটির,—জেটিটার ডান হাতে একেবারে শেষের বাড়িটা। বাড়িতে ঢুকে দেখি ঘরটা আগাগোড়া হাঁ ক'রে আছে, অন্যঘরেরও সেই দশা। ভেতরে একটা আসবাবপত্র বা এক টুকরো জানালার কাচও নেই ! প'ড়ে আছে শুধু কয়েকটা খড়ের গাদা, আরামকেদারার একটা পা চিমনির আগুনের মধ্যে জ্ব'লছে। অর্থাৎ সর্বত্রই প্রুশীয়দের চিহ্ন ! জার্মানদের পরিচয় পেলাম না এর কোথাও।

হঠাৎ মনে হ'লো, কে যেনো নিচের ঘরে নড়াচড়া ক'রছে। নিচে একটা বেঞ্চি ছিলো আমার ; বরাবর সেখানে ব'সে একটু আরাম ক'রতাম ! ছেলেটাকে ওপরে রেখে নেমে এলাম নিচেই।

দোর খুলে ঘরে ঢুকতেই বিরাট দেহধারী এক প্রুশীয় যোদ্ধা গর্জে উঠলো যাচ্ছে, তা' গালিগালাজ ক'রতে ক'রতে ধেয়ে এলো আমার দিকে চোখ দু'টো কটমট ক'রে। বুঝলাম, শয়তানের মৎলব তো সুবিধের নয়! কারণ, আমার কথা শোনামাত্রই সে তলোয়ার টেনে তুলছিলো।

মুহূর্তমধ্যে গায়ের রক্ত গরম হ'য়ে মাথায় উঠে গেলো। কয়েক ঘণ্টা ধরে যে তিক্ত পিত্তরস জেগে উঠেছিলো, এবার তা একেবারেই ঠেলে উঠলো। লোহার বেঞ্চিটা তুলেই ছুড়ে মারলাম তার উপর। তোমরা জানো সবাই, আমার হাতের ঘুষিটি কেমন বস্তু! সেদিন আমার কব্জিতে নেমে এলো বজ্রের বেগ, প্রথম ঘায়েই ধরাশায়ী হলো প্রুশীয়টি। ভাবলাম, অচেতন হ'য়ে প'ড়েছে বোধ হয়। আ-হা, এ যে একেবারেই চির-অচেতন! তখন আর কি করব? চট্ ক'রে এই সমস্যা থেকে স'রে পড়া!

আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা আশ্চর্যই ঠেকছিলো। সেদিন পর্যন্ত কোনো কিছুই হত্যা ক'রিনি আমি, এমন কি একটা পোকাও না। সেই আমিই চোখ মেলে দেখছি আমার নিজ হাতে হত্যা করা বিরাট ঐ দেহ! কিন্তু লোকটি তো সত্যিই সুন্দর! নরম তার সোনালি চুল, কোঁকড়ানো দাড়ি! দেখতে দেখতে আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপছিলো। আর এদিকে তখন বাচ্চাটা ওপরের ঘরে বসে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে— "বাবা, বাবা। কোথায় তুমি?"

কয়েকজন প্রুশীয়যোদ্ধা যাচ্ছিলো রাস্তা দিয়ে। নিচের ঘরটার কাচের জানালা পথে আমি দেখতে পেলাম তাদের ঝকমকে তলোয়ার আর লম্বা লম্বা পা! হঠাৎ একটা ভাবনা চমকে উঠলো আমার মাথার মধ্যে,—ওরা ঢুকে প'ড়লেই তো হ'য়ে গেছে ছেলেটার! ব্যস্, এই

ভাবনা টুকুই যথেষ্ট! তখন আর কাঁপছি না আমি। মুহূর্তের মধ্যে মৃতদেহটাকে বেঞ্চির তলায় টেনে আনলাম এবং কতকগুলি তক্তা ও অন্যান্য জিনিষপত্তর দিয়ে ঢেকে রেখেই ছুটে চ'ললাম উপরে ছেলেটার কাছে।

"এই তো আমি!"—ব'ললাম।

"এ কি বাবা, কি হ'য়েছে তোমার? কি রকম ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছো যে!"

"হ্যাঁ, চ'লো এবার!"

এখানে আপনাদের বলে রাখছি,—কশাকদের ডরাই না আমি,—তারা নিকনা আমার পিছু! কিন্তু সেদিন বারবারই মনে হ'চ্ছিলো কে যেনো আমাদের পিছু নিয়েছে আর চীৎকার ক'রে ব'লে দিচ্ছে সব! হঠাৎ একটা ঘোড়ার গাড়ি আমাদের দিকে জোর কদমে ছুটে এলে ভয়ে তো আমার ফিট হ'য়ে পড়ার দশা। পুলটা পেরোলে তবে সাহস ফিরে এলো কিছুটা। স্যাঁত্ দেনিসে লোকজন আছে অনেক। কে আর দেখতে পাবে আমাদের? যোদ্ধাটির কথাই ভাবছিলাম শুধু। প্রুশীয়েরা তাদের মৃত সংগীকে দেখতে পেলে নিশ্চিতই ঘরটা না পুড়িয়া ছাড়বে না। প্রতিবেশী জেকটের তখন যে কী দশা হবে তা' তো ভাবাই যায় না। গ্রামে সেই হোলো একটি মাত্র ফরাসীয়,—কাজেই সৈন্যটির মৃত্যুর জন্য তাকেই অভিযুক্ত করা হবে। সত্যি, এই ভাবে স'রে পড়ার মধ্যে মোটেই বাহাদুরী নেই!

বুঝলাম, এখনি মৃতদেহটাকে লুকিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। প্যারীর কাছাকাছি ঘনিয়ে আসতেই এই কথাটা বারবার মনের মধ্যে ঘুরতে লাগলো,—প্রুশীয়টাকে তো ঘরে রাখা চ'লবেনা। কাজেই স্যাঁত্ দেনিসে আর দেরী ক'রলাম না।

বাচ্চাটাকে ব'ললাম,—"যা, সোজা চ'লে যা তুই, আমি

আর এক জায়গায় দেখা ক'রবো।" তাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধ'রে ফিরে চ'ললাম নিজপথে। ক্রমেই বুক কাঁপতে লাগলো ঢিব্ ঢিব্ ক'রে। কিন্তু যা হোক, ছেলেটা তো সংগে নেই,—এইটেই স্বস্তির কথা!

ভিলন্যুভে ফিরে এলাম এবার। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। সজাগ চোখে এক এক পা এগোচ্ছি। চারদিক অবিশ্যি শান্ত স্তব্ধ! দূরে কুয়াশা-ঢাকা ঘরটা ঠিক চিনতে পাচ্ছি। জেটির ওপরে দেখা যায় দীর্ঘ একটি কালো শ্রেণী। প্রুশীয়রা সারি বেঁধে কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, নাম ডাকা হ'চ্ছে। আমাদের কুটিরটা খালি পাবার তো এই সুবর্ণ সুযোগ! যেতে যেতে পথে দেখলাম, জেকট তার জাল শুকোচ্ছে। তা হ'লে নিশ্চয়ই এখনো কিছু জানাজানি হয়নি! আমার ঘরে ঢুকেই সেই জিনিষপত্তরগুলো হাতড়াতে লাগলাম। হ্যাঁ, প্রুশীয়টা সেখানেই আছে। অবিশ্যি, ইতিমধ্যেই দুটো ইঁদুর এসে তার শিরস্ত্রাণটা নিয়ে লেগে পড়েছে। টুপির বেল্টটা একটু ন'ড়ে উঠতেই ভয়ে তো আমি আধমরা! ফিরে বেঁচে উঠলো নাকি? না, মাথাটা তো একেবারে ঠাণ্ডা হিম,—একেবারে পাথরের মতো ভারী।

গুঁড়ি মেরে সরে দাঁড়ালাম এক কোণে,—ভাবতে লাগলাম। ঠিক ক'রলাম, সবাই ঘুমুলে পরে এটাকে নিয়ে ফেলে দেবো সীন্ নদীর জলে।

মৃতের উপরে দরদের জন্য কি না জানি না,—তবে প্রুশীয়রা যখন পশ্চাদ্গমন বা পলায়নের ব্যবস্থা ক'রছিলো—আমি তখন যেনো খুবই ব্যথিত হলাম।

কিছুক্ষণ ধরে শুনলাম শুধু তলোয়ারের ঝনঝন্, আর দোরের ঠাস ঠাস শব্দ। তারপর যোদ্ধারা আমাদের আঙিনায় ঢুকে ডাকতে লাগলো: "হফম্যান, হফম্যান।"

বেচারা হফ্‌ম্যান তো তক্তার নীচে চুপ ক'রে আছে! তার বদলে তৈরী হ'য়ে নিলাম আমিই! যে কোনো মুহূর্তে সেই যোদ্ধাটি ভেতরে ঢুকতে পড়তে পারে। ভয় হচ্ছিলো তাই। মৃত যোদ্ধাটির তলোয়ারটা তুলে ঠিক তৈরীই হ'য়ে ছিলাম, নিজের মনেই ব'লছিলাম—এবারে এই বিপদ থেকে ত্রাণ পেতে চাও তো গির্জায় মানত্‌ রাখো।

যা হোক, হফম্যানকে কয়েকবার ডেকে আমার বাড়ির সেই সব ভদ্র ভাড়াটেরা ফিরে যাওয়াই স্থির করলো। সিঁড়িতে সিঁড়িতে শুনতে পাচ্ছিলাম তাদের ভারী বুটের দ্রুত শব্দ,—তারপর সমস্ত বাড়িটা প'ড়ে রইলো নিঃশব্দ নিঃসাড়। ঠিক এমন সময়টিরই প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম আমি। বাইরের দিকটায় তাকিয়ে দেখলাম একবার।

শূন্য, নির্জন সব—অন্ধকারে নিঝুম নীরব সব বাড়িঘর। ভালোই! তাড়াতাড়ি ক'রে নিচে নেমে এসে বেঞ্চিটার তলা থেকে টেনে বার ক'রলাম আমাদের হফ্‌ম্যানকে; সোজা দাঁড় করিয়ে এবারে তুলে নিলাম ঘাড়ের উপর—ঠিক মস্তো বড়ো একটা বোঝা বা বস্তার মতোই! ওরে বাবা, সে কি জগদ্দল-পাষাণ! আর, আমারো খালি পেট! ভয় হচ্ছিলো, গন্তব্যস্থল অবধি পৌঁছুতে পারবো কিনা। পথের মাঝামাঝি যেতেই পেছনে কার পায়ের শব্দ! মাথাটা ঘুরিয়ে তাকালাম। না, কেউ নয়। চাঁদ উঠেছিলো। চারদিকটা দেখে শুনে ভয় হ'লো, গার্ডরা গুলি ক'রতে পারে।

কিন্তু মুস্কিল, সীনের জল নেবে গেছে অনেক নিচে। মৃত দেহটাকে কূলে ফেলে দিলে তো সেখানেই প'ড়ে থাকবে। এগোতে লাগলাম; কিন্তু জল কৈ? আর নিচে নাবা যায় না; ঘনঘন শ্বাস প'ড়ছিলো, হাঁফাচ্ছিলাম শুধু! এবারে যখন অনেকটা দূর এসেছি ব'লে মনে হ'লো—দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ঐ যে ধপ্‌ করে প'ড়লো

কাদার মধ্যে! ঠেলে দিলাম, আরো,—আরো ঠেলে দিলাম। হ্যাঁ, ঐ, ঐ যে!

সুখের বিষয় পূব দিক থেকে হাওয়া দিলো হঠাৎ, নদী ফুলে উঠলো একটু, আর সেই মৃতদেহটাও কাদা থেকে জেগে ভেসে উঠলো। যাত্রা শুভ হোক হফ্‌ম্যান! এক আঁচল জল নিয়ে উঠে এলাম নদীর পারে।

ভিলন্যুভের পুল পার হ'তে গিয়ে দেখি,—জলের মধ্যে কালো কী যেনো একটা সবাই নজর ক'রে দেখছে। দূর থেকে দেখাচ্ছিলো ঠিক একটা ডিঙি নৌকোর মতোই। এ যে আমার হফ্‌ম্যান! সেই প্রুশীয়যোদ্ধাটি—স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে আসছে নদীর মাঝখানটা দিয়ে।

মঁস্যো সেগাঁ্যা-র ছাগল

(প্যারির বিখ্যাত গীতিকবি পিয়ার গ্রঁ্যাগোয়ারকে)

হায়রে গ্রঁ্যাগোয়ার! এই ভাবেই কি দিন কাটবে! আরো একটু ভেবে দেখো! প্যারীর বিখ্যাত এক পত্রিকার রিপোর্টারের পদ অর্পণ করা হলো তোমাকে—আর তুমি কিনা স্রেফ্ না জবাব দিয়ে দেবে! হায়রে হতভাগ্য যুবক,—নিজের দিকে চেয়ে দেখো একবার, তোমার গায়ের জীর্ণ আঙ্‌রাখা, ছেঁড়া প্যাণ্ট, শুকনো ক্লান্ত মুখ—দেখো, একটু ভাল ক'রে চেয়ে দেখো—সর্বত্রই তোমার বুভুক্ষার ছাপ। কবিতা মেলাবার নেশায়ই তো আজ এখানে এসে ঠেকেছো। দশটি বছর ধ'রে বাগ্‌দেবীকে সেবা করার এই তো ফল! এখনো কি লজ্জা হ'চ্ছে না তোমার? চেতনা হচ্ছে না?

রিপোর্টার হও গর্দভরাম, এর চেয়ে রিপোর্টার হও। আয় করবে কাঁচা টাকা, বাব্রঁর অফিসে তোমার জন্য পাতা থাকবে একটা বিশিষ্ট চেয়ার, আর রোজই পরতে পাবে নতুন নতুন স্যুট।

না, তবু যাবে না? চিরদিন স্বাধীন ভাবেই থাকতে চাও? আচ্ছা বেশ, তবে একটা গল্প বলি শোনো—মঁস্যো সেগাঁ্যা-র ছাগলের গল্প! স্বাধীন থাকতে চাওয়ার কী যে সুখ বুঝতে পারবে।

মঁস্যো সেগাঁ্যা-র ভাগ্যে কোনোদিনই ছাগল টেঁকেনি। ঠিক একই ভাবে খুইয়েছে সে সব কটি ছাগল। এক শুভ প্রভাতে দড়ি ছিঁড়ে তারা ছুট দেয় পাহাড়ে, আর তাদের খেয়ে ফেলে এক নেকড়ে! মনিবের আদর যত্ন বা কোনো রকম প্রলোভনই তাদের বেঁধে রাখতে

পারে নি,—নেকড়ের ভয়টা তাদের কাছে কিছুই নয়! তারা ছিলো—এই যাকে বলে "স্বাধীন ছাগল" বা ধর্মের ছাগল। চাই তার তাজা হাওয়া, চাই স্বাধীনতা।

নিতান্তই ভালো মানুষ এই মঁস্যো সেগ্যাঁ, তিনি তাঁর এই পালিত প্রাণীদের মর্জি বুঝতে না পেরে একটু বিষণ্ণই হ'য়ে পড়লেন। তিনি বললেন—

"কী যে করি! ছাগলেরা আমার ঘর দেখে শত্রুর কারাগারের মতো, ছাগল আর পুষবো না আমি।"

যাই হোক, তবু তিনি একেবারে দমে গেলেন না এবং একই ভাবে ছ' ছটা ছাগল হারিয়ে এবারে কিনলেন সপ্তমটি! খুব ভেবে চিন্তেই কিনলেন একটা বাচ্চা ছাগল,—শিশুকাল থেকেই কাছে কাছে রাখলে পোষ মানবে ভালো।

আহা গ্র্যাগোয়ার! কী যে সুন্দর ছিলো মঁস্যো সেগ্যাঁর-র এই ছাগল-ছানাটি। শান্ত নরম চোখ, তরুণ ফাদারের মতো দাড়ি, চকচকে কালো খুর, বাঁকা শিং আর সাদা পশমী কোটের মতো লোমভরা দেহ! গ্রঁ্যাগোয়ার, মনে আছে সেই ছাগলটাকে! এতো শান্ত, এতো আদুরে ছিলো সে! দুধ দোয়ানোর সময়ও একটু নড়তো না, ভাঁড়ের মধ্যে ভুলেও পা বাড়াতো না। একেবারে প্রেমে পড়বার মতোই ছাগল!

মঁস্যো সেগ্যাঁ-র ঘরের পেছনে ছিলো একটা বাগান, চারপাশে কাঁটার বেড়া। এখানে তিনি তার নতুন ছাগল-অতিথিকে থাকতে দিলেন। তাজা তাজা সবুজ ঘাসের মধ্যে তিনি তাকে বেঁধে রাখলেন, খুব লম্বা দড়ি লাগাতে ভুল হলো না,—মাঝে মাঝে শুধু দেখে আসেন ছাগলটি ভালো আছে কি না। খুব সুখেই থাকতে লাগলো সেই

ছাগল। এমন উৎসাহে সে লতাপাতা খেতে লাগলো যে মঁস্তো সেগ্যাঁ তো তা দেখেই আহ্লাদে আটখানা!

"এবার তা হলে এমন একটি ছাগল পেলাম, আমার ঘরে নিজেকে যে খাঁচা-বন্দীর মতো মনে করবে না।"—ভাবেন বৃদ্ধ সেগ্যাঁ।

তবু ভুল করলেন সেগ্যাঁ। খুব খুসী হ'য়ে উঠলো তার ছাগলটি, তবু একদিন সে দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মনেই বলছিলো—

"আঃ, ওখানে কী সুখেই থাকে সবাই। ঐ প্রান্তরের বুকে নেচে বেড়ানো কী যে আরামের, আর আমি এখানে আটক হ'য়ে আছি ঘাড়ে একটা মরণ-দড়ি নিয়ে! একটা গরু বা গাধার পক্ষে এ রকম বাগান বেশ ভালোই—কিন্তু ছাগলের কি মস্তো বড়ো প্রান্তর না হলে চলে?"

আর, সেই থেকেই তেতো হ'য়ে গেলো বাগানের ঘাস, অবসাদে এলিয়ে পড়লো সে, দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো, শুকিয়ে গেলো পালান। দিনরাতই সে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দড়ি টানাটানি করতে থাকে, নাক ফুলিয়ে ফুলিয়ে ডাকতে থাকে করুণ-ভাবে। সে কী করুণ দৃশ্য! মঁস্তো সেগ্যাঁ বুঝলেন, ছাগলটার একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়,—কী যে হ'য়েছে কিছুই ধরতে পারলেন না। তারপর একদিন ভোরবেলা দুধ দোয়ানো শেষ হ'তেই ছাগলটি মঁস্তো সেগ্যাঁর দিকে ফিরে তার স্বজাতীয় ভাষায় বলতে লাগলো—

"শুনুন মঁস্তো সেগ্যাঁ, আপনার বাগানের পাঁচিলের মাঝে থেকে যে ম'রে যাচ্ছি আমি,—আমাকে ছেড়ে দিন পাহাড়ে।"

"হায়রে কপাল, এটিও!"—মঁস্তো সেগ্যাঁ একেবারেই ঘাবড়ে যান, এই আকস্মিক ধাক্কায় ভাঁড়টাই উল্টে পড়ে যায় তার হাত থেকে।

তারপরে তিনি ছাগলটির পাশেই ব'সে প'ড়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেন—"ব্লাঁকেত্, তুমি, তুমিও ছেড়ে যাবে আমাকে?"

ব্লাঁকেত্ বলে—"হাঁ, মঁস্যো সেগাঁ।"

"এখানে কি পেট ভরে খেতে পাচ্ছো না তুমি?"

"হ্যাঁ, তা পাচ্ছি মঁস্যো সেগাঁ।"

"ও, তোমাকে খুব ছোটো দড়িতে বেঁধেছি?"

—দড়িটা বড়ো ক'রে দেন তিনি।

"এতে কোনোই লাভ হবে না, মঁস্যো সেগাঁ।"

"তবে তুমি কী চাও?"

"পাহাড়ে চ'লে যেতে চাই।"

"ও, এই বদ মতলব তোমার, বদমায়েশিতে পেয়েছে? ওখানে এক নেকড়ে আছে, জানো না? সেটা এলে করবে কী?"

"শিং দিয়ে গুঁতো দিয়ে দেবো।"

"নেকড়ে তোমার শিংকে ডরায় নাকি? তোমার চেয়ে বড়ো বড়ো শিং শুদ্ধ ছাগলও খেয়েছে সে। বেচারা রেনোদকে মনে নেই তোমার?—আগের বছরেও তো ছিলো সে এখানে। কী চমৎকার ছাগলই ছিলো সে, যেমন মোটাসোটা তেমন জোয়ান, আর কাঁটার মতো কেমন খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। সমস্ত রাত ধরেই নেকড়ের সাথে যুদ্ধ করেছিলো সে, তারপর ভোরবেলা সাবাড় হয়ে যায়।"

"সত্যিই খুব দুঃখের! তবে মঁস্যো সেগাঁ, তাতে আর কি হলো? আমাকে যেতে দিন পাহাড়ে।"

"হায়রে কপাল!"—মঁস্যো সেগাঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—"কে যে আমার ছাগলের মাথায় এমন কুবুদ্ধি ঢোকালো? নেকড়ে তো এটিকেও শেষ ক'রে দেবে। না, না সে হবে না। তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই

বাঁচাবো তোমাকে। তুমি শয়তান। সন্দেহ হয়, দড়ি ছিঁড়েই পালাবে তুমি, তোমাকে তাই খোয়াড়েই আটকে রাখবো, সেখানেই থাকবে এবার।”

মঁস্যো সেগ্যা অমনি ছাগলটিকে নিয়ে এলেন একটা অন্ধকুঠুরীতে এবং খুব শক্ত করেই এঁটে দিলেন দোরটা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা; খোয়াড়ের জানলাটার কথা মনেই ছিলো না! ভদ্রলোক পেছন ফিরতেই তো ছাগল দেয় ছুট্।

হাসছো গ্রঁ্যাগোয়ার? খুব হাসছো? তুমিও তা হ'লে এই ছাগলের দলে,—আর বিপক্ষে হলো মঁস্যো সেগ্যা। বেশ! দেখছি হাসি বজায় থাকে কতক্ষণ?

শাদা ছাগলটি যখন পাহাড়ে গিয়ে উঠলো চারদিকেই সে কী আনন্দ! বুড়ো ফার গাছগুলো কোনো দিন আর এমন সুন্দর প্রাণী দেখে নি। সবাই মিলে তাকে অভ্যর্থনা করলো—ছোট্ট এক রাণীর মতোই! চেষ্টনাটের ডাল নুয়ে পড়ে তাকে আদর করতে থাকে। সোনালী উলুখড় তাকে পথ করে দেয় বনের মাঝ দিয়ে, তাদের মিষ্টি নিশ্বাস ছাড়িয়ে দেয় চারদিকে। সমস্ত পাহাড়েই লেগে যায় তার মিলন উৎসব।

বুঝতেই পারছো গ্রঁ্যাগোয়ার, কী স্ফূর্তি যে হ'লো আমাদের এই ছাগলটির! দড়ির বাঁধন নেই, খুঁটি নেই,—ইচ্ছে খুসী কেবল মাঠে মাঠে চরে নেচে কুঁদে বেড়ানো।

পাহাড়ে মস্তো উঁচু উঁচু ঘাস—ছাগলটির শিংএর মাথার উপরেও উঁচিয়ে ওঠে। বুঝলে বন্ধু, সে কী ঘাস, কী যে সুন্দর, আর কতো রকমের! পাঁচিল ঘেরা ঘাসের থেকে একেবারে নতুন! কতো যে ফুল—বড়ো বড়ো নীল নীল বেল ফুল, লালচে গ্লোভ ফুল!

কী সুন্দর তাদের বড়ো বড়ো কেশর! সে যেনো এক বুনো ফুলের দেশ, মদির সুরভিতে চারদিক পাগোল।

শাদা ছাগলটি আধা-পাগলার মতো শূন্যে পা ছড়িয়ে লাফাতে লাগলো, গড়াতে লাগলো ঢালু প্রান্তরে ঝরা পাতা আর বাদামের সংগে; আবার একলাফে উঠে মাথা নীচু করে ছুটে চলে ঊর্ধশ্বাসে—বনঝোপের মাঝ দিয়ে। মাঝে মাঝে উঠে যায় চূড়ার উপরে—কখনো বা গিরিসংকটের তলায়। উপরে নীচে—সর্বত্র! সর্বত্রই এই চাঞ্চল্য দেখে মনে হবে, এখানে অন্তত পঞ্চাশটা ছাগল আছে মঁস্যো সেগ্যার।

ব্লাঁকেত্ এখন আর ভয় খায় না কিছুতেই। এক লাফে সে পেরিয়ে যায় প্রশস্ত ঝরণা, আর যেতে যেতে গায়ে গায়ে লাগে ফেনিল জলকনার ঝাপটা। ভিজা গায়ে সমতল শিলার উপর শুয়ে রোদে শুকোতে দেয় সমস্ত দেহ। এবারে একটা পাতা চিবোতে চিবোতে পাহাড়ের একপ্রান্তে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো মঁস্যো সেগ্যার সেই পাঁচিলঘেরা বাগান। হাসির বেগ সামলাতে না পেরে গলা ছেড়ে সে চেঁচাতে লাগলো—"ফুঃ, কী ছোট্ট জায়গা! ওখানে কী ক'রে ছিলাম যে সত্যি!"

হায়রে বেচারা! অতো উঁচুতে দাঁড়িয়ে এবার তার বিশ্বাস হলো, অন্তত পক্ষে পৃথিবীর মতোই বড়ো সে।

সত্যিই, সেদিনটা মঁস্যো সেগ্যার ছাগলের একটা দিনের মতো দিন বটে! ত্নপুরবেলা সে এদিক ওদিক ছুটোছুটি ক'রেই কাটিয়ে দিলো; —হঠাৎ সে এসে পড়লো একদল শ্যাময়ের কাছে, তারা বুনো আঙুর খাচ্ছিলো ঘুরে ঘুরে। আমাদের ভবঘুরে এই শ্বেতাংগী ছাগলটি এসে এক সাড়া জাগিয়ে তুললো চারদিকে।

ছাগলটিকে তারা আঙুর বনের সেরা জায়গাটিই ছেড়ে দিলো। বেশ ভদ্র ও উদার বটে! আর তখন—বুঝলে গ্রাঁ্যাগোয়ার, এ শুধু তোমার আমার মাঝে গোপন কথা,—বুঝলে বন্ধু, তখন সুন্দর চেহারার কালো একটি তরুণ শ্যাময় তার ভাগ্যগুণেই আমাদের এই ব্লাঁকেতের সুনজরে পড়ে গেলো। তরুণ প্রণয়ী দুটি ঘণ্টা দুয়ের জন্য চলে গেলো বনের গভীরে। তাদের আলাপ-সালাপ যদি জানবার আগ্রহ থাকে তো জিজ্ঞেস করো গিয়ে মুখরা ঝরণাকে—শ্যাওলায় গা-ঢাকা দিয়ে নীরবে বয়ে চলেছে যে ঝরণা।

হঠাৎ হাওয়া বইতে সুরু হলো, মিঠে হাওয়া। লাল হ'য়ে উঠলো পাহাড়, নেমে এলো সন্ধ্যা।

"এর ভেতরই!"—ব'লে উঠলো ছাগলটি, বিস্মিত হ'য়ে সে থমকে দাড়ায়।

নীচের প্রান্তরগুলি ডুবে গেছে কুয়াশায়· মঁস্যো সেগ্যার বাগান হারিয়ে গেছে তার ভেতরে, একটু একটু দেখা যায় শুধু ছাদটা,—একটা ধুঁয়োর রেখা উঠছে সেখান থেকে। একদল প্রাণী মাঠ থেকে 'বাড়ী ফিরছে, আর ঘণ্টা বাজছে ঝুং ঝুং। এবার প্রাণ তার কেমন করে ওঠে। একটা বাজ উড়ে গেলো তার বাসায়, পাখার ঝাপটা লাগিয়ে গেলো ব্লাঁকেতের গায়ের উপরেই। চমকে ওঠে সে! চমকে ওঠে সে; হঠাৎ সমস্ত পাহাড় কাঁপিয়ে উঠলো একটা গর্জন,—"হাউ, হাউ!"

নেকড়ের কথা মনে হলো তার। সারাদিনেও মনে হয়নি আর। ঠিক তখনই প্রান্তরের ওপার থেকে উঠলো একটা শিঙার আহ্বান,—মঁস্যো সেগ্যা শেষ চেষ্টা ক'রে দেখছেন।

হাউ, হাউ!"—আবার গর্জে ওঠে নেকড়ে।

"এসো, ফিরে এসো!"—আবারো আহ্বান জানায় শিঙা। ব্লাঁকেত্ ফিরে যেতে চায় এবার,—কিন্তু সেই কাঁটা বেড়ার মাঝে খুঁটিটা মনে পড়তেই সেই পুরোণো জীবনে নিজেকে সে আর খাপ খাওয়াতে পারে না। না, যেখানে এসেছে সেখানে থাকাই শ্রেয়। সংগে সংগে থেমে যায় শিঙার আহ্বান।

ছাগলটি এবার তার ঠিক পেছনেই শুনতে পেলো পাতার খসখসানি। মাথা ঘুরিয়ে অন্ধকারে সে দেখতে পেলো ছোটো ছোটো দুটি খাড়া কান, আর আগুনের ঝলকার মতো মস্তো বড়ো বড়ো চোখ!

হাঁটুর উপর ভর ক'রে বসে আছে সে। বিরাট একটি দেহ—স্থির নিস্পন্দ। চেয়ে আছে সে ছোট্ট ছাগলটির দিকে, আর জিভ্ দিয়ে ওষ্ঠ চাটছে—স্বাগত আশার আস্বাদে! ছাগলটিকে তো যখন খুসী খেয়ে ফেলতে পারে, তাই নেকড়েটা কোনো রকম তাড়া করে না। ছাগলটি ঘুরে দাঁড়ালেই সে যেনো হাসতে থাকে শয়তানির হাসি। "হাঃ হাঃ, মঁস্যো সেগ্যাঁ-র আদরের ছাগল!"—বলে, আর তার মস্তো বড়ো লাল টকটকে জিভ দিয়ে নিজের চিবুক চাটতে থাকে নেকড়ে।

ব্লাঁকেত্ বুঝলো—আর তার রক্ষে নেই। মনে পড়লো রেনোদে-র কাহিনী—সারারাত ধরে যুদ্ধ ক'রে তবেই তো গিয়েছে সে নেকড়ের পেটে। যায় তো সেও যাবে অমন করেই। ভেবে ভেবে মনে জোর এনে সে "যুদ্ধং দেহি" ব'লে দাঁড়িয়ে ওঠে,— মাথা নীচু করে শিং দেয় উঁচিয়ে। সেগ্যাঁ-র ছাগল বটে! নেকড়েটাকে সে যে মেরে ফেলতে পারে সে কথা নয়,—ছাগলে কি কখনো নেকড়েকে মারতে পারে? রেনোদে-র মতোই কতোক্ষণ ধ'রে যুঝতে পারে তাই দেখবে সে। এদিকে তক্ষুনি জানোয়ারটা এলো এগিয়ে—ছোটো ছোটো শিং দুটিও অমনি যুদ্ধের খেলা দেখাতে লেগে গেলো!

বেড়ে ছাগল ! কী সাহসেই যে যুদ্ধ করতে লাগলো সে। দশ বারো বার,—হ্যাঁ সত্যি বলছি গ্রঁ্যাগোয়ার, এমন কি নেকড়েকেই দিলো হটিয়ে ! পিছু হটেই নেকড়ে তবে হাঁফ ছাড়তে পারে। এই ফাঁকে আমাদের এই ছোট্ট পেটুক ছাগলটি এক গ্রাস ঘাস নিয়ে চিবোতে লাগলো আরাম ক'রে এবং ভরা মুখেই লড়াই সুরু করলো আবার। সমস্ত রাত। মঁস্যো সেগ্যা-র ছাগলটি মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছিলো নির্মল আকাশ আর উজ্জ্বল তারাদের দিকে, এবং নিজ মনেই বলছিলো —"ওঃ ভোর অবধি যদি ঠেকিয়ে রাখতে পারি।"

তারাগুলি নিভে যেতে লাগলো একে একে। ব্লাঁকেত্ তার শিং-এর জোরেই যুদ্ধ করতে লাগলো দ্বিগুণ বিক্রমে, আর নেকড়ে তার দাঁতের জোরে। দিগন্তে ফুটে উঠছে ফ্যাকাশে আলো। দূরে এক কিষাণ বাড়ী থেকে আসছে মোরগের কর্কশ ডাক !

"এবার !"—বেচারা ভাবে, মরবার জন্যই সে ভোরের প্রতীক্ষা কচ্ছিলো। এবার মাটিতে পড়ে রইলো তার শুভ্র নধর দেহ,—লাল রক্তে রাঙা !

বিদায় গ্রঁ্যাগোয়ার !

গল্পটা আমার তৈরী গল্প নয়; যদি কখনো এদিকে আসো তো আমাদের কিষাণরাই বলবে তোমাকে মঁস্যো সেগ্যা-র ছাগলটি সারারাত কী ক'রে নেকড়ের সংগে যুদ্ধ করেছিলো,— তারপর ভোরবেলায় নেকড়েটা খেয়ে ফেলে তাকে।

বুঝলে গ্রঁ্যাগোয়ার—

"তারপর ভোর বেলায় নেকড়েটা খেয়ে ফেলে তাকে !"

প্রান্তরের বুকে মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর

মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বাইরে বেরিয়েছেন, সামনে কোচোয়ান, পেছনে চাকর। বিশিষ্ট এক সরকারী গাড়িতে গর্বিত চালে চলেছেন তিনি কৌব-ও-ফে-র জিলা-সম্মেলনে। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর পরে এসেছেন কারুকাজ করা সার্ট, উঁচু টুপি, রূপোর বাগু-আঁটা ব্রিচেস, আর মুক্তোর হাতলওয়ালা মূল্যবান তলোয়ার: হাঁটুর উপরে চামড়ার পোর্টফলিওটা, সেদিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে আছেন তিনি।

পোর্টফলিওটার দিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে আছেন ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর। কৌব-ও-ফে-র অধিবাসীদের কাছে যে স্মরণীয় বক্তৃতাটা দেবেন—সেই কথাই ভাবছেন তিনি।—"হে আমার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ ......" গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে ঐ একটা কথাই বার বিশেক পুনরাবৃত্তি ক'রে চ'ললেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই কাজ হ'লো না। "হে আমার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ ......"— বাকীটা আসছে না কিছুতেই!

বাকীটা আসছে না কিছুতেই, গাড়ীর ভেতর যা গরম! যতোদূর দৃষ্টি যায় কৌব-ও-ফে-র পথ ঝ'লসে উঠছে শুকনো ধূলোয়—চৈত্র রোদে, আগুন লেগেছে বাতাসে, পথপাশের ধূলিধূসর দেওদার গাছের সারিতে ডাকাডাকি ক'রছে হাজার হাজার পোকা। হঠাৎ মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর যেনো চমকে ওঠেন। ঐ দূরে—পাহাড়ের তলায় দেখা যায় সবুজ ওকগাছের ঝোপ, হাতছানির মতো!

হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেনো—"আসুন, এখানে আসুন, মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর! এখানে ব'সে ব'সে আপনার বক্তৃতা তৈরী ক'রবেন, আমার ছায়ায় ব'সলে চমৎকার প্রেরণা পাবেন,......"

মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর লুব্ধ হ'য়ে ওঠেন, গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেবে পড়ে তিনি তাঁর লোকদের ব'ললেন অপেক্ষা ক'রতে—ওকগাছের ছায়ায় ব'সে তার বক্তৃতাটা লিখে ফিরে না আসা পর্যন্ত।

সেই ওকগাছের তলায় সুন্দর ঘাস আর ভায়লেট ফুলের মেলা, আর উজ্জ্বল ঝর্ণা,—গাছে গাছে কূজন ক'রছে পাখীরা। চামড়া বাঁধানো পোর্টফলিও হাতে, ঝলমলে ব্রিচেস পরা এই ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে দেখতে পেয়েই তো পাখীরা ভয়ে থেমে যায় হঠাৎ। ঝর্ণারও সাহস হচ্ছিলো না টুঁ শব্দ করে আর, ভায়লেট রইলো ঘাসের বুকে মুখ লুকিয়ে......তাদের এই ছোট্ট দুনিয়াটি আর কখনো ম্যাজিষ্ট্রেট দেখেনি,—সবাই তাই চুপিচুপি বলাবলি করতে থাকে,—"চমৎকার রূপোলি পোষাক পরে কে বেড়াচ্ছেন উনি ?"

সবুজ ঘাসের তলায় ফিস্ ফিস্ করে তারা বলাবলি ক'রতে থাকে—চমৎকার পোষাক প'রে কে বেড়াচ্ছেন উনি ?...... এদিকে মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এই গাছের ছায়ার নিঝুম শান্তিতে খুশি হ'য়ে উঠে খুলে দিলেন জামার বোতাম,—টুপিটাও ছেড়ে রাখলেন ঘাসের উপর, বসে পড়লেন ওক-চারাটার নীচে শস্প-শয্যায়। এবারে চামড়া বাঁধানো পোর্টফলিওটা হাঁটুর উপরে খুলে ধরে তার মধ্য থেকে বের করে নিলেন মস্তো বড়ো এক সিট সরকারী কাগজ। "নিশ্চয়ই কোনো শিল্পী ইনি—" বলে

বুলবুল। টুনটুনি ব'লে ওঠে—"না গো, না, শিল্পী নন উনি,— কেমন রূপোলি ব্রিচেস পরা দেখছো না? বরং কোনো রাজপুত্তুর!"

"বরং কোনো রাজপুত্তুর"—বলে টুনটুনি। "না, না, শিল্পীও নয়, রাজপুত্তুরও নয়!"—মাঝখানে বাধা দেয় এসে এক বুড়ো বিজ্ঞ দোয়েল, অনেক গভর্ণরের বাগানেই সে গান গেয়ে এসেছে অনেক বসন্ত! সে বলে ওঠে—"জানি আমি, জানি, উনি এক ম্যাজিষ্ট্রেট!" সমস্ত বনই অমনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে উঠলো—"ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যাজিষ্ট্রেট্ উনি?" "এঃ, কি রকম টাকপড়া মাথা!"—বলে ঝুঁটিওয়ালা টিয়ে। ভায়লেট মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—"উনি কি খুব খারাপ লোক?"

"উনি কি খুব খারাপ লোক?" জিজ্ঞেস করে ভায়লেট। বিজ্ঞ দোয়েল উত্তর দেয়—"না, তা নয়!" ভরসা পেয়ে পাখীরা গান ধরে আবার, ঝর্ণা চঞ্চল পা ফেলে চলে ঝর্‌ঝর্ ক'রে, ভায়লেট তার সুরভি নিশ্বাস দেয় বাতাসে ছড়িয়ে,—ভদ্রলোক যে এখানে তা যেনো তারা ভুলেই গেছে।......এই কূজন-কলনীর মাঝে মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সোল্লাসে আওড়াতে থাকেন কৃষক প্রজাদের কাছে তাঁর বক্তৃতা।—পেন্সিলটা উঁচিয়ে বিশিষ্টতম সরকারী আদবে সুরু ক'রে দেন,—"হে আমার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ......"

"হে আমার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ......"—বিশিষ্ট গর্বিত ভংগীতেই বলতে থাকেন তিনি। হঠাৎ এক ঝলক হাস্যধ্বনি এসে বাধা দেয় তাঁকে; কিন্তু ঘুরে ফিরে তিনি আর কিছুই দেখতে পান না,—একটা কাঠঠোকরা শুধু টুপিটার উপরে ব'সে তাঁর দিকে চেয়ে চেয়েই হাসছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাঁধ কুঁচকে ওঠে, তিনি ফিরে

আবার তাঁর বক্তৃতা রচনা করতে লেগে যান, কিন্তু কাঠঠোকরাটা বাধা দেয় আবারো এবং দূর থেকেই জোরে জোরে ব'লে ওঠে—"ও সব ক'রে আর হবে কি!" "কী আর হবে?"—ম্যাজিষ্ট্রেট রাঙা হ'য়ে ওঠেন, উদ্ধত অভদ্র পাখীটাকে হাত নেড়ে তাড়া দিয়ে আবারো তিনি সুরু করেন—"হে আমার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ......"

"হে আমার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ!"—আবারো তিনি সুরু করেন। এদিকে তখন? ছোটো ছোটো ভায়লেটরা ডাঁটার উপর ভর করে উঁচু হয়ে দেখে তাঁকে, আর আলগোছে বলে, "মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর! দেখছেন না, কী সুন্দর আমরা!" শস্পের তলায় ঝর্ণাধারা গেয়ে ওঠে এক স্বর্গীয় গান, আর তাঁর মাথার উপরকার ডালেই এক ঝাঁক বুলবুলি এসে জুড়ে দেয় কী মিষ্টি গান! সমস্ত বনদেশই তার বক্তৃতার মাঝে বাধা দেয়

তার বক্তৃতার মাঝে বাধা দেয় সমস্ত বনদেশ। মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সৌরভে মত্ত হ'য়ে উঠলেন,—পাগোল হ'য়ে উঠলেন গানে গানে; তার উপরে চুপি চুপি বিছিয়ে পড়ে বিচিত্র মায়ার নেশা,—কিছুতেই তিনি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেন না। ঘাসের উপর দেহ এলিয়ে, জামার বোতাম আগাগোড়া খুলে দিয়ে তখনো তিনি তোত্‌লাতে থাকেন,—"হে আমার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ......হে আমার অধীনস্থ......হে আমার অধী......" এবার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকে জাহান্নামেই পাঠিয়ে দিলেন,—কৃষক প্রজাদের কথা প'ড়ে রইলো কোন চুলোয়!

কৃষক প্রজাদের কথা প'ড়ে রইলো কোন চুলোয়! থাক সে নিজের মনে! ঘণ্টাখানেক পরে কোচোয়ান ও চাকর তাদের মনিবের

কথা ভেবে ভেবে উদ্বিগ্ন হ'য়েই চ'লে এলো সেই ছোট্ট প্রান্তরে ; কিন্তু সব দেখেই তো তারা শংকিত হয়ে ওঠে। একি ! মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ঘাসের উপর উবুড় হয়ে শুয়ে,—ভোলানাথের মতোই প্রায় দিগম্বর ! কোটটা একেবারে খুলে তিনি ভায়লেট ফুলের ডাঁটা চিবোতে চিবোতে লিখে চলেছেন কবিতা !

রাজকুমারের মৃত্যু

ছোট্ট রাজকুমারের অসুখ ক'রেছে। মরে যাবে সে। রাজ্যের সমস্ত গির্জায়ই দিনরাত প্রার্থনা চ'লেছে। রাজপুত্রের আরোগ্য কামনায় সমস্ত মোমবাতিগুলিই জ্বালিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। প্রাচীন রাজপথগুলো প'ড়ে আছে বিষণ্ণ, নির্জন। ঘণ্টা বাজছে না, গাড়ীগুলো চলেছে আস্তে আস্তে। উৎসুক নাগরিকেরা রাজপ্রাসাদের লৌহফটক দিয়ে চেয়ে দেখে: দূতেরা উদ্যানে ব'সে পরস্পর আলোচনা ক'চ্ছে। তাদের মুখে কেমন একটা উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে।

সমস্ত প্রাসাদেই নেমে এসেছে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। দাসদাসী ও পরিচারিকারা সিঁড়ি দিয়ে ছুটোছুটি ক'রছে। গ্যালারীগুলোতে ভিড় ক'রে আছে আরদালিরা। সভাসদেরা প'রে এসেছেন আজ কালো পোষাক। একদলের কাছ থেকে আর এক দলের কাছে গিয়ে চাপা গলায় তাঁরা শুধু অসুখের খবরই জানতে চাইছেন। প্রশস্ত সিঁড়িপথে বিশিষ্ট ভাড়াটে কাঁদুনেরা সম্ভ্রমভরে চোখ মুছছে সুন্দর সুন্দর কারুকাজ-করা রুমাল দিয়ে।

উদ্যানের পাশে রাজবৈদ্যরা সকলে সমবেত হয়েছেন। জানালার সার্সি পথে দেখা যায়: তাঁরা বারবার শুধু বাগানের এদিক ওদিক পায়চারী ক'রছেন, আর বিজ্ঞের মত পরচুলা-পরা মাথা নাড়ছেন শুধু। ডাক্তারের অভিমত জানবার জন্যে গভর্ণর ও সভাসদেরা অস্বস্তিভরে ঘোরাফেরা ক'রছেন। ঝি-চাকরেরা তাদের পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছে, নিয়মমাফিক নমস্কার জানাতেও ভুলে গেছে আজ।

রাজকুমারের জন্য তারা দেবতার কাছে মানত ক'রছে—ঠিক পৌত্তলিকদের মতোই। গভর্ণরও 'হোরেসের' পবিত্র কবিতা আবৃত্তি ক'রে চ'লেছেন। একটু পরেই আস্তাবলের পাশে শোনা গেলো অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। সহিসেরা আজ ওদের খাবার দিতে ভুলে গেছে। তাই ওরা অমন করুণ গলায় ডাকছে বারবার।

আর রাজার কথা! মহামান্য রাজবাহাদুর আজ কোথায়? প্রাসাদের এক প্রান্তে একটা কক্ষে তিনি দোর বন্ধ ক'রে ব'সে আছেন। রাজপরিবারের কেউ প্রকাশ্যে চোখের জল ফেলতে চাননা। কিন্তু রাণীর কথা আলাদা। ছোট্ট রাজকুমারের বিছানার পাশে ব'সে রয়েছেন তিনি, আর চোখের জল গড়িয়ে প'ড়ছে তার সুন্দর মুখের উপর দিয়ে।

ঝালর-ঝুলানো পালংকে শুয়ে আছে রাজকুমার। চোখ দুটি তার বোজা। মুখখানি ধবধবে বিছানার চেয়েও ফ্যাকাশে। বুঝি বা ঘুমিয়ে প'ড়েছে সে। কিন্তু না, কুমার এখনো ঘুমোয়নি। মুখ ফিরিয়ে সে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মা কাঁদছে দেখে রাজকুমার বল্লো, "কাঁদছো কেন মা? আর সবাইর মতো তুমিও বুঝি ভাবছো, আমি ম'রে যাবো?" রাণী কিছু ব'লতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কান্নায় তাঁর গলা ধরে এলো।

"কেঁদ না, রাণীমা। ভুলে যাচ্ছো কেন, আমি যে রাজকুমার! রাজকুমারেরা কি কখনও এভাবে ম'রতে পারে?" রাণী আরও জোরে কেঁদে উঠলেন; ছোট্ট কুমারেরও কেমন ভয় করতে লাগলো।

"চুপ কর", ব'ল্লো সে, "মৃত্যু আমাকে কিচ্ছুতে নিয়ে যেতে পারবে না। আর সে না আসতে পারে এই ক'রে তবে ছাড়বো। এক্ষুণি ব'লে দাও, নাম করা চল্লিশজন রক্ষী এসে আমার বিছানার চারদিকে

পাহারা দেবে। আর এই জানালার ঠিক নীচেই টোটাভরা কামান নিয়ে দিনরাত প্রস্তুত থাকবে একশ' গোলন্দাজ। দেখি মৃত্যু আমার কাছে আসে কি ক'রে।"

রাজকুমারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই রাণী তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন। আর সেই মুহূর্তে বিরাট বিরাট কামানগুলো উদ্যানে এসে জড়ো হ'লো। রক্ষীদল কক্ষ মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালো। প্রত্যেকের হাতেই ভীষণ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র। সকলেই প্রবীণ যোদ্ধা; মাথার চুল পেকে গেছে। কুমার তাদের দেখতে পেয়ে খুসীতে হাততালি দিয়ে ওঠে। একজনকে চিনতে পেরেছে সে! তাকে ডেকে ব'ল্লো: "লরেন, লরেন।" বৃদ্ধ সৈনিক তার বিছানার কাছে এগিয়ে আসে।

"লরেন, তুমি কি ভালো! তোমার তলোয়ারটা আমাকে একবারটি দেখাও তো। মৃত্যু যদি আসেই তা হ'লে তুমি তাকে হত্যা ক'রবে; কেমন, পারবে না?" "পারবো কুমার", লরেন উত্তর দেয়। বড়ো বড়ো দু'ফোঁটা অশ্রু তার গাল বেয়ে ঝ'রে পড়ল।

এমন সময় এক ধর্মযাজক এলেন। কুমারের কাছে একটা ক্রুশ এনে বহুক্ষণ ধরে নীচু গলায় তিনি তার কানে কানে কি ব'ল্লেন। বিস্মিতের মতোই কুমার তার কথা শুনে যাচ্ছিলো। হঠাৎ তাঁকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো সে, "আপনার কথা সবই বুঝতে পাচ্ছি আমি। কিন্তু··· আচ্ছা, আমার বদলে আমার বন্ধু বেপ্পো ম'রলে হয়না? অনেক টাকা দিই যদি? তা হ'লেও হবে না?"

ধর্মযাজকটি কিন্তু চাপা গলায় ব'লেই যাচ্ছেন। কুমারের বিস্ময়ও বেড়ে ওঠে।

এবার কুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লো, "আপনি যা ব'লছেন, সবই

খুব করুণ, খুব দুঃখের। কিন্তু একটা কথা ভেবে তবু আনন্দ হ'চ্ছে: স্বর্গে গিয়েও আমি রাজকুমারই থেকে যাবো।······ভগবান তো আমার একান্ত আপনার। তাই এখানার মতো সেখানেও জুটবে আমার সমান আদর।" তারপর মায়ের দিকে ফিরে সে ব'লতে থাকে, "আমার সব দামী পোষাকগুলিই এনে দাও, মা। সেই ধবধবে মোলায়েম পশমের কোট, আর সেই ভেলভেটের দস্তানা—সবই আনতে ব'লে দাও।"

শেষবারের মতো ধর্মযাজকটি তার কানে কানে বহুক্ষণ ধরে কি যেনো ব'লছিলেন। হঠাৎ মাঝখানেই রাজকুমার বাধা দিয়ে রেগে উঠলো,—"রাজকুমার হওয়া কি তা হ'লে কিছুই নয়?" কুমার এবারে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নীরবে কাঁদতে লাগলো শুধু!

পোপ মরে গেছেন!

আমার শৈশব কেটেছে এক মফঃস্বল শহরে। শহরটাকে দুভাগ করে দিয়ে চলে গেছে কর্ম্মব্যস্ত এক চিরচঞ্চল নদী। এই নদীর বুক থেকেই পেয়েছি আমি ভ্রমণের পিপাসা, আর নেয়ে জীবনের অপূর্ব উন্মাদনা। স্যাঁ-ভ্যাঁসাঁর পুলের কাছে সেই জেটিটার কথা মনে করলে আজো প্রাণ ভরে ওঠে। আজো আবার যেনো দেখতে পাই সেই আঙিনাটার প্রান্তে আঁটা একটা সাইনবোর্ড!

"নৌকো ভাড়া দেওয়া হয়। ইতি কর্‌নে।"

ছোট্ট সিঁড়িটা নেমে গেছে জলের মধ্যে, স্যাওলা প'ড়ে প'ড়ে সেটা পেছল-কালো হ'য়ে আছে। ঝকমকে ছোটো ছোটো নৌকোগুলি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সেই সিঁড়িটার নীচ থেকে, আর দোল খাচ্ছে। সুন্দর সুন্দর শাদা অক্ষরে এক একটার গলুইতে লেখা —"গানের পাখী" "শুভ্র কপোত" "রাজহংসী" আরো কতো নাম! এই সব নামের অহংকারেই যেনো তারা খুশির দোল খাচ্ছে।

শাদা রঙমাখা দীর্ঘ দাঁড়গুলি শুকোচ্ছে তীরের উপর। ফাদার কর্‌নে ঘুরছেন সেখানে। হাতে রঙের হাড়ি ও ব্রাশ। তার মুখের চামড়া রোদে পোড়া, মুখ কোঁচকানো—কতো শত রেখা, কতো ছোটো ছোটো ভাঁজ ও টোল সে মুখের উপর! সন্ধ্যায় যখন মুক্ত হাওয়া দিতে থাকে নদীর জলের উপর—ঠিক তখনকার মতোই অমসৃণ! ওঃ সেই ফাদার কর্‌নে! শনি ছিলো সে আমার জীবনের মূলে,—কারণ ছিলো সে আমার দুঃখের, আমার সর্ব্বনাশা

আবেগের, আমার পাপের, আর আমার অনুশোচনার, সে তার ঐ নৌকোর লোভ দেখিয়ে কতো অপরাধের মুখেই যে আমাকে ঠেলে দিয়েছে! স্কুল কামাই করেছি কতো, ফেলে দিয়েছি বই! একটি সন্ধ্যেয় নৌকোয় একটু বেড়ানোর জন্য কী যে না দিতে পারতাম তখন!

নৌকোর তলায় প'ড়ে থাকে সমস্ত বই, খুলে ফেলি জামা, টুপিটা ঝুলে থাকে পিঠের উপর, আমার চুলে খেলা করতে থাকে নদীর মিঠে হাওয়া—হাতপাখার আদরের মতো! আপ্রাণ বেগে চালাতে থাকি বৈঠা, তুটি ভুরু কুঁচকে ওঠে সরলরেখায়, আমাকেই দেখায় একটা শুশুকের মতো! শহরের আওতা পর্যন্ত নদীর মাঝখানটা আঁকড়ে ধ'রে চলতে থাকি—তুই তীর সমান দূরে রেখে, এই শুশুকটিকে কেউ চিনে ফেলতে না পারে। নদীপথে ভাসমান কাঠ বাঁশ আর নৌকোর পর নৌকোর মিছিল,—দীর্ঘ মিছিল! পরস্পর পাশ কেটে উজিয়ে চলেছে অনেক লঞ্চ,—তাদের মাঝপথে পাশাপাশি তুলে তুলে চলেছে ফেনিল জলরেখা। ভারী ভারী মাল-নৌকো অনুকূল স্রোতের মুখে ঘুরে ফিরে চলছে,—আর পিছিয়ে দিচ্ছে অন্য সব নৌকোর সারিকে।

হঠাৎ আমার কাছেই জল তোলপাড় করতে করতে গর্জে ওঠে ষ্টীমারের চাকা, কখনো বা সামনেই দেখা যায় ফলভরা একটি নৌকোর ফুলে-ওঠা পাল। তার ছায়া এসে পড়ে আমার গায়ে!

"এই, এই আপন ডান! আপন ডান!"—খেঁকিয়ে ওঠে কার ভাঙা গলা! আর আমিও প্রাণপণ দাঁড় ঠেলি, ঘাম বেরিয়ে আসে সর্বাংগে, যাতায়াত-চঞ্চল ···স্রোতের পাকে প'ড়ে যাই। পুলের উপরকার ব্যস্ত জনতা অতিক্রম ক'রে চলে স্রোতের উপর দিয়ে,—মোটর বাসের ধাবন্ত ছায়া পড়ে দাঁড় নিক্ষিপ্ত চলন্ত ঘূর্ণীস্রোতে।

পুলের তলা দিয়ে স্রোত ছুটে চলেছে, দুর্বার বেগে দুর্দম স্রোত—লা মর্তের বিষম ঘূর্ণ্যাবর্ত। এর মধ্য দিয়ে উজিয়ে চলা সহজ কথাটি নয় নিশ্চয়ই! আর তাও বারো বছরের দুটি বাহুর জোরে,—হাল ধরবার সাথী নেই কেউ!

কখনো বা ভাগ্যগুণে নৌকোসারির নাগাল পেলাম হাতে। চট করে দীর্ঘ নৌকোশ্রেণীর প্রান্ত ভাগটিতে নিজের নৌকোটিকে বেঁধে ফেলতাম শেকল দিয়ে। গুণের টানে এগিয়ে চলতো সামনের নৌকো,—আমি দাঁড় তুলে রেখে উজিয়ে চলতাম উড়ন্ত ডানায়। নিজেকে ছেড়ে দিতাম এই নিঃশব্দ গতিবেগের মুখে। নদীর বুকের মাঝখান দিয়ে আঁকা হতে থাকে দীর্ঘ ফেনরেখা,—দীর্ঘশুভ্র ফিতের মতো। সাথে সাথে ছুটে চলে দুই তীরের গাছের সারি, আর ঘর বাড়ী। সামনে দূর থেকে,—অনেক দূর থেকে আসছে এক টানা মিলের আওয়াজ, গুণ-টানা একটা নৌকোয় ডাকছে কুকুর, ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে নৌকোর উনুন থেকে। আর আমার মনে হয়, চলেছি যেনো কোন দূর যাত্রায়—নেয়ে জীবনের অকূল নেশায়!

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায়ই এই নৌকোসারির সাহায্য হাতের কাছে পেতাম না, প্রায়ই আমাকে প্রাণপণ ইচ্ছা ঠেলে এগুতে হতো—মাথা ফাটানো দুপুর রোদে। নদীর বুকে খাড়াখাড়ি পড়েছে দুপুরের রোদ। এখনো মনে হয়, সেই রোদে যেনো পুড়ে উঠছে গা! সব কিছুই ঝলমল করছে চারিদিকে। সেই চোখ ধাঁধাঁনো মুখর আবহাওয়ার মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে উচ্ছল তরংগদোলা, তারি তালে তালে পড়ছে দাঁড়ের ছোটো ছোটো আঘাত, জলে ডুবে ডুবে নেয়ে উঠছে নৌকোর গুণ, আর তা থেকে জল পড়ছে টপ্ টপ্ ক'রে—রূপোলি ফোঁটার মতো! আর আমি চোখ বুজে বৈঠা

ঠেলে যাই প্রাণপণ। আমার নৌকোর তলায় স্রোতের বেজায় কলকলানি শুনে, আর আমার শ্রান্ত ঘর্মাক্ত দেহ দেখে মনে হতে থাকে—খুব বেগেই চলেছি তবে, কিন্তু মাথা তুলেই চোখে পড়ে সেই গাছ এবং তীরের সেই পাঁচিল!

শেষে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোদে আধমরা হয়ে শহর ছাড়িয়ে যেতে সমর্থ হই। ধীরে ধীরে স্তিমিত হ'য়ে পড়ে শহরের সোরগোল, বন্দরের কোলাহল, নৌকোর হৈ চৈ! প্রশস্ত নদীর উপরে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে এক একটা পুল। শহরতলীর বাগানবাড়ী ও কারখানার উঁচু চিমনির ছায়া-ছবি দেখা যায় জলের বুকে! দিগন্তে ঝিলমিল ক'রে কেঁপে ওঠে কোনো দ্বীপের সবুজ রেখা। আর চলতে না পেরে ভিড়ে পড়ি তীরের কোলে—অসংখ্য জীবন-মুখর শর ও খড় বনের মাঝে। বড়ো বড়ো কচুরীফুলে শোভিত জলরাশি থেকে উঠতে থাকে উষ্ণ নিশ্বাস; রোদে তাপে আর ক্লান্তিতে আমি ভেঙে পড়ি। এই ক্ষুদে জলশিশুটির নাক দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ঝরতে থাকে রক্ত! পথের শেষে প্রত্যেকবারেই! এ ছাড়া আর কী বা হবে!—তবু মনে হয় তাই ছিলো আমার পরম আনন্দের!

কিন্তু শহরে ফিরে আসা—আমাদের বাড়ীতে ফিরে আসাই হয় একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রাণপণ শক্তিতে বৃথাই বারবার নৌকো চালাতে থাকি ফিরতি পথে, তবু প্রত্যেক বারেই পৌঁছোই গিয়ে স্কুল ছুটির ঢের—ঢের পরে। নেমে আসে রাত্রির নিঃশব্দ ছায়া, দিগন্তে জমে ওঠে কুয়াশা;—ভয় হয় আমার, অনুশোচনায় ভরে ওঠে বুক! নিশ্চিন্ত শান্তিতে সবাই এখন ফিরেছে নিজ নিজ বাড়ীতে,—তাদের উপর আমার কেমন হিংসে হয়!

এবারে মাথা কামড়াতে সুরু করে। রোদেজলে গা ভিজা,

কানে তখনো সেই নদীর কলগর্জন, আমার মুখে লজ্জার ছাপ, —এখনি তো গিয়ে একটা মিছে কথা বলতে হবে বানিয়ে।

ওদিকে যে দোরেই খাড়া হয়ে আছে কঠিন একটি প্রশ্ন— "কোথায় ছিলে?" আমাকেও প্রত্যেকবারেই বলতে হয় বানানো কথা। উপস্থিত হওয়া মাত্র সেই প্রশ্নের কথা ভাবতেই ভয় খেয়ে যাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখনি জবাব জোগাতে হবে, তৈরী রাখতে হবে একটা বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী। বেশ নতুন রকম একটা বিশ্বাসযোগ্য বিস্ময়কর কাহিনী,—প্রথম বিস্ময়ের আঘাতেই সব কড়া প্রশ্ন তলিয়ে যাবে এমন কিছু একটা; এবং সেই ফাঁকেই দম টেনে নিয়ে যা হোক একটা বিশদ কৈফিয়ৎ ভেবে রাখার এক অপূর্ব ফুরসুত্!—শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিতে অবশ্যি বিশেষ একটা বেগও পেতে হয় না। বলে চলি ভয়ানক সব কাহিনী! সে এক সাংঘাতিক মারামারি, শহরের কোথাও অগ্নিকাণ্ড, অথবা লাগসই ক'রে বলে দিই—নদীর মধ্যে রেললাইন ভেঙে পড়ার বিচিত্র সংবাদ! কিন্তু একবার যা সর্বনাশা কাণ্ড ক'রে ফেললাম।

সেদিন বাড়ী ফিরেছি খুব দেরিতে—একেবারে ঘোর সন্ধ্যায়। আমার মা এক ঘণ্টা ধ'রে আমার পথ চেয়ে আছেন,—ছাতে দাড়িয়ে আছেন আমার খোঁজে।

"ছিলে কোথায় এতক্ষণ?"—কড়া সুরেই তিনি কৈফিয়ৎ চাইলেন।

সত্যি, কচি মাথায় যে কতো শয়তানিই খেলে! কিছুই তো আজ ভেবে রাখিনি, মোটেই তৈরী নই, বড়ো তাড়াহুড়ো ক'রেই এসেছি যে! হঠাৎ মাথার মধ্যে খেলে যায় একটা উদ্ভট ভাবনা! ভালো ক'রেই জানতাম আমার মা খুব ধর্মপরায়ণা—একেবারে পাদ্রীদের মতোই। আমিও নিতান্ত ভাবাবেগেই হঠাৎ ব'লে ফেললাম:

"মা, মা, তা যদি শোনো ?"

"কি, কি হ'য়েছে ?"

"পোপ ম'রে গেছেন, মা !"

"পোপ—ম'রে গেছেন ?"—মায়ের মুখ মড়ার মতোই ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। দেয়ালে ভর ক'রে না দাঁড়ালে প'ড়েই যেতেন তিনি। আমি তো চট ক'রে ছুটে যাই ঘরের মধ্যে।

আশাতীত সাফল্য দেখে ঘাবড়ে যাই, আর মিথ্যের বহরখানা মেপে ভয় খেয়ে যাই ! তবু শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার মতো সং-সাহস আছে আমার পুরো মাত্রায়ই। মনে পড়ে সেই বিষণ্ণ সুন্দর সন্ধ্যা : গম্ভীরমুখে ব'সে আছেন বাবা, মা একেবারেই ভেঙে পড়েছেন —টেবিলের পাশে ব'সে তাঁরা কথা বলছেন চাপা গলায়। আমি তো আর চোখ তুলতে পারি না ! ঘরের এই বিষণ্ণ পরিবেশের মধ্যে তলিয়ে গেছে সমস্ত সন্দেহ।

বাবা মা দুজনেই সম্ভ্রমভরে নবম পায়াসের গুণাবলীর আলোচনায় লেগে গেছেন—প্রতিযোগিতার মতোই ! আলোচনার স্রোতে ধীরে ধীরে উজিয়ে চলে পোপদের দীর্ঘ ইতিহাসের ধারা। রোজ্ পিসি বলতে থাকেন সপ্তম পায়াসের কথা ; তিনি তাঁকে একেবারে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, ছ-ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে দক্ষিণে কোথাও যাচ্ছিলেন —সংগে ছিলো দেহরক্ষী। সে সবি তাঁর ঠিক ঠিক মনে আছে আজো।

কেউ কেউ স্মরণ কচ্ছিলো সম্রাটের সংগে তাঁর সেই বিখ্যাত সম্মিলন —সেই কমেডি, সেই ট্রাজেডি ! এই কাহিনীটা কতো শতোবার যে বর্ণনা করা হয়েছে,—সেই একই ভাষা, একই বর্ণনাভংগী—একই বিষয়বস্তু ! মান্ধাতা আমলের সেই একঘেয়ে ধারা ! যেমন ছেলে-

মানুষি, তেমনি একান্ত পরিচয়গত বা ব্যক্তিগত কথা।—ধর্ম-কাহিনীর মতোই বৈচিত্র্যহীন !

আমার কাছে কোনোদিনই এসব কাহিনী একটুও মজার মনে হয় নি। মাঝে মাঝে তবু কপট ব্যথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে কতো কথা বারবার জিজ্ঞেস করি,—বিশেষ আগ্রহে শুনতে থাকার ভাব দেখাই, আর ভাবি শুধু নিজের মনে—

"কাল ভোরে যখন জানতে পাবে যে পোপ মরে নি—এতো খুসী হবে এরা যে আমাকে মারবার কথা আর মনেই পড়বে না।"

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি—আর স্বপ্ন দেখি ! ছোটো ছোটো নীল রঙের নৌকো, কেমন সুন্দর সুন্দর তাদের গলুই,—রোদের মধ্যে ঝিমুচ্ছে। জলমাকড়সারা ছুটছে তাদের লম্বা লম্বা পা চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে। কাচের মতো স্বচ্ছ নীল জল তাদের পায়ে পায়ে কেটে চলেছে, তীক্ষ্ণধার হীরের মতো !

বুড়ো বুড়ী

"ফাদার আর্জাঁ, চিঠি এসেছে ?"

"হ্যাঁ মঁস্যো, প্যারী থেকে।"

প্যারীর চিঠি? গর্বে ভ'রে ওঠে তার সারা বুক। তবে আমার নয়, এত ভোরে প্যারীর এই চিঠির এমন হঠাৎ আবির্ভাব মানেই আমার সমস্ত দিনটা মাটি,—মন থেকেই যেনো ব'লে উঠছিলো বারবার। ঠিকই ধরেছিলাম। আপনারাই বলুন না ?—

"আমার একটা উপকার করো বন্ধু। আজকের জন্যে মিলটা বন্ধ রেখে সোজা চ'লে যাও এইগিয়ের গ্রামে। এখান থেকে কয়েক মাইল মাত্র। বেশ আরাম ক'রেই যাবে আর কি! সেখানে পৌঁছে অনাথ আশ্রমের কথা জিজ্ঞেস ক'রবে। আশ্রমের পরেই পাবে একটা নিচু বাড়ি। জানলাগুলিতে খড়খড়ি দেওয়া; পেছনেই ছোট্ট ফুলের বাগান। সোজা ভেতরে চ'লে যাবে,—বাড়ির দরজা সব সময়ই খোলা থাকে। ঘরে ঢুকে গলা ছেড়ে ডাক দেবে: এই যে শুনুন, আমি মরিসের বন্ধু। তখনি দেখতে পাবে দুই বুড়োবুড়িকে,—খুব বুড়ো, একেবারে থুনথুনে বুড়ো। ইজিচেয়ারে ব'সেই তারা তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে'খন। আমার হ'য়ে তুমি তাদের প্রাণভ'রে জড়িয়ে ধ'রবে। তারা যে তোমার আপনার জন। তারপর আলাপ ক'রবে। আমার কথাই ব'লবে তারা, শুধু আমার কথা—আর কিছুই নয়। হয়ত তারা অনেক বাজে কথাও ব'লবে। চুপ করে শুনে যাবে শুধু। কিছুতেই হাসবে না, হাসবে না বলো ? তারা আমারই ঠাকুরদা

আর ঠাকুমা। তাদের জীবনের সর্বস্ব আমি। আজ দশ বছর তারা আমাকে দেখেনি—দীর্ঘ দশ বছর! কিন্তু আমিই বা কি ক'রতে পারি? আমি আটকা প'ড়ে গেছি প্যারীতে, আর তারা আটকা প'ড়েছে তাদের বার্ধক্যে। এতো বুড়ো তারা যে আমাকে দেখতে আসার পথেই হয়তো হাত পা ভেঙে প'ড়ে থাকবে। ভাগ্যিস, তুমি কাছেই রয়েছো। তোমাকে স্নেহে জড়িয়ে ধ'রে সেই হতভাগ্যরা তবু ভাববে, আমাকেই যেনো আদর ক'চ্ছে। আমি তাদের কাছে তোমার কথা, তোমার গভীর ভালবাসার কথা”—

চুলোয় যাক বন্ধুত্ব! সেদিন আকাশের অবস্থা ছিলো ভালোই। তবে, রাস্তায় হাঁটার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। পল্লী অঞ্চলে বেড়াবার মতো দিনই বটে! এদিকে সেই অলক্ষুণে চিঠিটা আসার আগেই ঠিক ক'রে রেখেছি: দুই পাহাড়ের মাঝে গিয়ে বাঁধবো ছুটির নীড়; আর স্বপ্নের মতো ক'রে ভেবে রেখেছি: সারাদিন সেখানে ব'সে বসে পান ক'রবো আলোর মদিরা, শুনবো ব'সে পাইনবনের গান—ঠিক একটি প্রজাপতির মতোই। কিন্তু এখন কি করি? বিরক্তিভরেই মিল বন্ধ ক'রে দিয়ে দোরের নিচে চাবিটা রাখলাম। তারপর ছড়ি ও পাইপ, ব্যস! বেড়িয়ে প'ড়লাম এবারে।

বেলা দুটোয় এইগিয়ের্ গ্রামে এসে পৌছুলাম। সারা গ্রামে জনপ্রাণীর সাড়াটি নেই। সবাই মাঠে। গোলবাড়িটার সামনে এলুম্ গাছগুলো ধূলো প'ড়ে প'ড়ে শাদা হ'য়ে আছে। গঙ্গাফড়িং গেয়ে চ'লেছে প্রাণের খুশিতে। দূরে ঐ খোলা ময়দানে চ'রছে একটা গাধা—মেয়রের অফিসের সামনেই। ঝর্ণার পাশে এক ঝাঁক পায়রা। কিন্তু আমাকে পথ দেখিয়ে দেয় কে? ভাগ্যিস হঠাৎ চোখে প'ড়লো: আশ্চর্য এক বুড়ি তার দরজার সামনে ব'সে সুতো কাটছে। কি চাইছি

তাকে খুলে বললাম। সে হাত দিয়ে ইংগিত ক'রলো শুধু। আর তক্ষুণি যেনো ম্যাজিকের মতোই আমার সামনে এসে দাঁড়ালো সেই অনাথ আশ্রম। বিরাট উঁচু দালান। কিন্তু সর্বত্র কেমন যেনো একটা অন্ধকার বিষণ্ণভাব গুমোট্ হ'য়ে আছে। দোরের উপরে পাথরের একটা প্রাচীন ক্রুশচিহ্ন। তাতে লাতিন ভাষায় কি যেনো লেখা। এই আশ্রমের পরেই দেখতে পেলাম ছোট একটা বাড়ি। জানলায় ধূসর রংয়ের খড়খড়ি, পেছনেই বাগান। চিনতে দেরি হ'ল না। কড়া না নেড়েই সোজা ঢুকে প'ড়লাম।

জীবনে কোনোদিনই আর সে বারান্দার কথা ভুলতে পারবো না—সেই দীর্ঘ, শান্ত, স্তব্ধ বারান্দা; লালচে তার দেয়ালগুলি। জানলার ফিকে রং পর্দার মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছে: সামনের ছোট্ট বাগানটি বারবার যেনো কেঁপে কেঁপে উঠছে। জানলার উপরে শুকিয়ে আসা ফুলের গোছা আর একটা বীণা। মনে হচ্ছিলো, আমি যেনো এগিয়ে চলেছি সে কোন্ অজানা রাজপুরীতে। বারান্দার শেষপ্রান্তে বাম দিকে একটা আধাখোলা দরজার ভেতর দিয়ে কানে আসছে দেয়াল ঘড়ির টিকটিক্ শব্দ। একটী ছোট্ট শিশু থেমে থেমে প'ড়ছে "তা-র-প-র সা-ধু ই-রে-না-য়ু-স ব-লি-য়া উঠি-লেন: আ-মি প্র-ভু ঈ-শ্ব-রে-র স-ন্তা-ন। এই জ-ন্তু-গু-লি দাঁত দি-য়া আ-মা-কে ছিঁ-ন্ন ক-রি-য়া ফেলু-ক।"

দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে চেয়ে দেখলাম:

শোবার ঘরের শান্ত আলোর মাঝে শুয়ে আছে এক বুড়ো। আঙুলের ডগাগুলো পর্যন্ত তার কুঁচকে গেছে,—কুঁচকে গেছে মুখের চামড়া; চিবুক ঝুলে প'ড়েছে, হাঁটুর উপর হাত দু'খানা গুটানো। একটি ছোট্ট মেয়ে তার পায়ের কাছে ব'সে কি একটা বই থেকে সাধু ইরেনায়ুসের জীবন কাহিনী প'ড়ছে। মেয়েটির গায়ে নীল পোশাক;

মাথায় ছোট্ট একটা টুপি। এখানকার পোশাকই এই রকম। মেয়েটি প'ড়ছে আর সমস্ত ঘরে ভরে উঠছে এক অদ্ভুত আবহাওয়া। বুড়ো ঘুমিয়ে প'ড়েছে চেয়ারে—মাছিগুলো ছাতের কড়িবরগায় আর ময়না ছুটো তাদের খাঁচায়। দেয়ালঘড়িটা ঘুমের ঘোরে নাক ডেকে চ'লেছে—টিক্ টিক্, টিক্ টিক্। ঘুমিয়ে আছে ঘরের সব কিছুই। জানলার বন্ধ খড়খড়ি পথে ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছে এক ঝলক আলো। আর সেখানে ঝির্‌ঝির্ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে কতোশতো জীবন্ত স্ফুলিংগ—অসংখ্য জীবাণু,—ঠিক ঘুর্ণীর মতোই। এই ঝিমিয়ে পড়া নিস্তব্ধতার মাঝেও ছোট্ট মেয়েটি একটানা প'ড়ে চ'লেছেঃ হ-ঠাৎ দু-ই-টা সিং-হ আ-সি-য়া তা-হা-কে খা-ইয়া ফে-লি-ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি গিয়ে ঢুকলাম। সাধু ইরেনায়ুসের সিংহ ছুটো ঘরে ঢুকে প'ড়লেও বোধ হয় তারা এ রকম বিমূঢ় হ'য়ে প'ড়তো না। সে রংগমঞ্চের এক চমৎকার দৃশ্য বটে! ভয়ে আঁৎকে উঠলো ছোট্ট মেয়েটি, প'ড়ে গেলো বইটা; হেসে উঠলো পাখী ও মাছিগুলি, বেজে উঠলো ঘড়িটা; বুড়ো ভয়ে চ'ম্‌কে উঠে ব'সলো। আমিও কিছুটা বিব্রত হ'য়ে দোরের মুখেই দাঁড়িয়ে পড়ি, চেঁচিয়ে ব'লে উঠি "এই যে, কে আছেন শুনুন, আমি মরিসের বন্ধু।"

তখন যদি তুমি বুড়োর সেই করুণ দশাটা একবার দেখতে! দেখতে যদি একবার, কেমন ক'রে সে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো প্রাণপণে, হাত বুলিয়ে দিলো সারা গায়ে। বুড়ো পাগলের মতো ঘরময় ছুটোছুটি ক'রতে ক'রতে ব'লছিলো শুধু—

"মঁ দিঅ্য, মঁ দিঅ্য।"

তার মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠলো এক অপূর্ব্ব হাসি। লাল হ'য়ে উঠলো সারা গাল, কথা বেঁধে গেলো বারবার।

"আ, তুমি, তুমি !"

এবারে সে ঘরের শেষ প্রান্তে ছুটে গিয়ে ডাক দিলো :

"মামেৎ, মামেৎ, এই যে শোনো।"

খুলে গেলো দোর। ঘরের ভেতর শোনা যাচ্ছে কার যেনো চলাফেরার খস্ খস্ শব্দ। এই হ'লো মামেৎ ! এই বুড়ির চেয়ে সুন্দর আর কী আছে ! পরণে সাদাসিদে একটা গাউন আর একটা সুন্দর ফিতে, হাতে কারুকাজকরা একখানা রুমাল। প্রাচীন দিনের মতো আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে সে। ভারী করুণ সেই ছবি। —বুড়োবুড়ি দুজনেই দেখতে ঠিক এক রকম। একগোছা চুল থাকলে বুড়োকেও মামেৎ বলা চ'লতো। চোখের জল ফেলে ফেলেই কেটেছে মামেতের সারাজীবন। মুখের চামড়া তার আরো বেশী কোঁচকানো। বুড়োর মতো সেও অনাথ আশ্রমের একটি ছোট্ট মেয়েকে বাড়িতে রেখেছে। মেয়েটির মাথায় পরা নীল টুপি। দিনরাত মামেতের কাছে থাকে সে, তার সেবাশুশ্রূষা করে। এই বুড়োবুড়ি ছোট্ট দুটি মেয়ের উপর নির্ভর ক'রেই বেঁচে আছে —ভাবতেও দুঃখ হয়। সত্যি সে করুণ !

মামেৎ এসে মাথা নীচু ক'রে আমাকে অভিবাদন জানালো। কিন্তু হঠাৎ বুড়ো মাঝখানেই ব'লে বসে :

"এ মরিসেরই বন্ধু।"

আর বুড়ি অমনি কাঁপতে কাঁপতে ঝর্ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললো, হাতের রুমাল খসে প'ড়লো, মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো। তার অবস্থা বুড়োর চেয়েও শোচনীয়। এই বুড়োবুড়ির সমস্ত শরীরে আছে তো কয়েক ফোঁটা রক্ত ! আর তাও সামান্য আবেগের আঘাতেই সারা মুখে ছুটে আসে।

"শিগগির, শিগ্‌গির একটা চেয়ার," বুড়ি ছোট্ট মেয়েটিকে বললো!

"জানলাটা খুলে দাও," বুড়োও তারটিকে বলে।

তারা দু'জনেই ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে হাত ধ'রে আমাকে জানলার কাছে নিয়ে এলো। আমার মুখখানি আরো ভালো ক'রে দেখতে পাবে ব'লে জানালাটা আগাগোড়াই খুলে দেওয়া হ'লো। চেয়ার এলে তাদের মাঝখানে ব'সলাম আমি। ছোট্ট মেয়ে দুটি আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে। এবারে শুরু হ'লো নানা কথা।

"কেমন আছে সে? কি ক'রছে? আমাদের দেখতে আসেনা কেন? সে সুখে আছে তো?" এটা সেটা নানা রকমের খবর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা! যথাসাধ্য সব প্রশ্নের উত্তরই দিলাম। বন্ধুর কথা যা জানতাম, রং চং দিয়ে বাড়িয়ে ব'ললাম, যা জানতাম না তাও নির্লজ্জের মতো বানিয়ে ব'লে দিলাম। কেমন ঘরে থাকে সে, খায় বা কিরকম খাবার—তার কিছুই যে আমি খোঁজখবর রাখিনা, কথাটা বেফাঁস না হ'য়ে যায়, তাই প্রতিটি মুহূর্তেই সতর্ক ছিলাম।

"তার শোবার ঘরের কথা? বেশ ফিটফাট ঘরটি, যেমনি আলো তেমনি হাওয়া।"

"সত্যি?"—বুড়ি আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। স্বামীর দিকে ফিরে বলে সে,—"কী লক্ষ্মী ছেলে আমাদের মরিস্!"

"সত্যিই লক্ষ্মী," বুড়োও সোৎসাহে সায় দেয়।

আমি কথা ব'লে যাচ্ছি। আর এদিকে তারা এ ওর দিকে মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছে, কখনো বা মৃদু হাসছে, চোখাচোখি ক'রছে, —বিনিময় ক'রছে অর্থপূর্ণ চাউনি। কখনো বা বুড়ো আমার দিকে ঝুঁকে প'ড়ে ব'লছে:

"জোরে বলো, বুড়ি কানে একটু কম শোনে।"

বুড়িও বলে, "একটু জোরে, বুড়ো ভালো শুনতে পায় না কিনা !"

আমি এবারে উঁচু গলায়ই ব'লতে থাকি। তারাও একটু মিষ্টি হেসে আমাকে ধন্যবাদ জানায়,—আমার দিকে চেয়ে থাকে উন্মুখ দৃষ্টিতে, আমার চোখের গভীরে খুঁজে পেতে চায় তাদেরই মরিসকে। ব্যথিত মুখে ফুটে ওঠে মলিন হাসি। আর তাদের চোখে বন্ধুর অস্পষ্ট অবগুণ্ঠিত ক্ষীণ ছায়া দেখে আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে—আমার বন্ধু যেনো কুয়াশাচ্ছন্ন কতো দূরদূরান্ত থেকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে একটু একটু।

হঠাৎ বুড়ো চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসে।

"মামেৎ, ভোরে সে কিছুই খায়নি হয়তো।"

মামেৎও হতাশায় হাত মোচড়াতে থাকে।

"এখনো খায়নি, ওঃ ভগবান !"

এখনো তারা সেই মরিসের কথা নিয়েই দুশ্চিন্তা ক'রছে ? ভাবলাম, ব'লে দিই : মরিস বরাবর দুপুরের আগেই তার খাওয়া সেরে নেয়। সেদিকে ঠিক আছে সে। কিন্তু না, তারা আমার কথাই ব'লছে যে ! আমি খেয়ে আসিনি শুনে তাদের যে কি অবস্থাটা হ'লো তা যদি দেখতে একবার !

"শিগগির খাবার টেবিলটা গুছিয়ে দাও, আমার বাছারা। ঘরের মাঝখানটায় টেবিলটা রাখো, রঙীন্ টেবিল-ক্লথ্‌টা, ফুল তোলা প্লেটগুলো —সবই। অতো হেসোনা, জল্‌দি কর মা আমার।"

হ্যাঁ, খুব শিগ্‌গিরি তারা সব কিছু নিয়ে এলো। তাড়াহুড়োতে আর একটু হ'লেই প্লেটগুলো ভেঙে যেতো আর কি !

"চমৎকার খাবার !" আমাকে টেবিলের কাছে নিয়ে যেতে যেতে মামেৎ ব'লছিলো, "একা প'ড়ে গেলে তুমি, আগেই আমরা খেয়ে নিয়েছি।"

হায় হতভাগ্য বুড়োবুড়ি। যখনই তাদের কাছে যাও—আগেই খেয়ে নিয়েছে তারা!

প্লেটের উপরে সাজানো রয়েছে এক গ্লাস দুধ, কয়েকটা খেজুর আর কয়েকটা পিঠে। এতে অবশ্যি মামেৎ ও তার ময়নার গোটা হপ্তাই চ'লে যেতে পারে। কিন্তু আমি একাই খেয়ে ফেলেছিলাম সব কিছু। সবাই তো অবাক। ছোট্ট মেয়ে দুটি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেনো বলাবলি কচ্ছিলো আর এ ওর গায়ে ঢ'লে পড়ছিলো। খাঁচার ময়নাগুলোও যেনো এ ওকে ব'লছে, "দেখো, ভদ্রলোক সবটাই খেয়ে ফেললেন!"

সত্যি আমি সবটাই খেয়ে ফেলেছিলাম। প্লেটের দিকে একটিবার ভ্রূক্ষেপও করিনি। চেয়ে চেয়ে বিভোর হ'য়ে দেখছিলাম শুধু,—কেমন সুন্দর শান্তিময় সেই ঘর আর সকালবেলার কেমন মিঠে আলো, চারদিকেই ভরে আছে যেনো প্রাচীন দিনের সুরভি।

ছোট্ট দুটি বিছানা দেখে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে। মস্তো বড়ো মশারির আড়ালে ভোরের আলোতে ঐ ছোট্ট বিছানা দুটো দেখে মনে হচ্ছিলো দুটি দোলনার মতোই। পাঁচটা বাজলো; এই সময়েই সব বুড়োদের ঘুম ভাঙে।

"এখনো ঘুমুচ্ছো, মামেৎ?"

"না, ঘুমুচ্ছিনা।"

"ভারী চমৎকার ছেলে আমাদের মরিস্, না?"

"সত্যিই চমৎকার।"

ঐ দুটো বিছানা পাশাপাশি দেখেই মনে হ'লো, এমন কতো কথাই এখন তারা ব'লে যাবে।

একটু পরেই ঘরের শেষ প্রান্তে তাকের সামনে ঘটলো সে এক

মহাকাণ্ড! তাকটার একেবারে উপরে দশ বছর ধ'রে মরিসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে একটা সুগন্ধি সুরার বোতল। সেইটে আজ আমার সম্মানার্থে খোলা হবে। এখন সেই উপর তাক থেকে বোতলটা নামাতে হবে—ব্যাপারটা হচ্ছে এই। মামেতের অনুরোধ সত্বেও বুড়ো নিজেই সিরাপের বোতলটা নামাবার জন্যে কুলুঙ্গির কাছে এগিয়ে এলো। একটা চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়ালো সে, মামেৎ তো ভয়ে অস্থির। বুড়ো এবারে তাকের উপর হাত বাড়ালো। একবার ভাবো সে দৃশ্য! বুড়ো-আঙুলের উপর ভর ক'রে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে, সর্বাংগ থর থর ক'রে কাঁপছে। ছোট্ট মেয়ে দুটি চেয়ারের গা ঘেঁষে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পেছনে মামেৎ। তার দম যেনো বন্ধ হ'য়ে আসছে; ভয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় সে। ঘরময় ভুরভুর ক'চ্ছে সিরাপের গন্ধ। ভারী চমৎকার সে দৃশ্য!

অনেক চেষ্টার শেষে বুড়ো তাক থেকে সুরার বোতল ও তার সংগে একটা রূপোর কাপ নামালো। কাপটার অনেক জায়গাতেই ম'রচে ধরে গেছে, কোনো কোনো জায়গা ছেঁদা হয়ে আছে। মরিসের সেই ছোটবেলাকার কাপ! কাপটা সিরাপ দিয়ে কানায় কানায় ভ'রে আমার কাছে এগিয়ে দিলো তারা। মরিস্ সিরাপ এতো ভালবাসে! সিরাপ ঢালতে ঢালতে লোভী মানুষের মতোই বুড়ো ফিসফিস করে বলছিলো:

"তোমার ভাগ্য ভালো! আমার স্ত্রী নিজ হাতেই তৈরী ক'রেছে এটা। চমৎকার জিনিষটি, খেয়ে দেখো!"

তার স্ত্রীর নিজ হাতেই তৈরী বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, মিষ্টি দিতেই ভুলে গেছে সে! এর বেশী বা কি আশা করা যায়? বয়সের সাথে সাথে লোকে সব কিছুই ভুলে যেতে থাকে। বেচারী মামেৎ!

তোমার সিরাপ হ'য়েছে একেবারেই অপদার্থ! কিন্তু তবুও মুখ একটুও বিকৃত না ক'রে নিঃশব্দে খেয়ে ফেললাম সবটা।

খাওয়া শেষ হ'লে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে উঠলাম। আমাকে আরো একটুকাল রাখতে পারলে তারা কতো যে খুসি! মরিসের কথা বলতে তাদের কতো যে আনন্দ! কিন্তু বেলা প'ড়ে আসছিলো; মিলও বহুদূরে। কাজেই উঠতে হ'লো।

বুড়োও উঠে দাঁড়ালো।

"মামেৎ,আমার কোটটা! এই পার্ক পর্য্যন্ত একে এগিয়ে দিয়ে আসবো।"

মামেৎ বুঝলো, এখন এই ঠাণ্ডার মধ্যে যাওয়া বুড়োর পক্ষে কোনো রকমেই ঠিক নয়, কিন্তু কিছুই ব'ললো না সে। তাকে চমৎকার পশমী কোটটা পরিয়ে দিতে দিতে গভীর দরদের সুরে মামেৎ ব'লছিলো:

"বাইরে বেশীক্ষণ থেকোনা কিন্তু।"

বুড়ো দুষ্টু ছেলের মতো তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে।

"তা কেমন ক'রে বলি, মামেৎ, হয়তো......"

বুড়োবুড়ি এ ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলো। ছোট্ট মেয়ে দুটিও তাদের দেখে হেসে ফেলে, ঘরের কোণে খাঁচার সেই ময়নাদুটিও।

রাত হ'য়ে আসছে। আমি ও ঠাকুর্দা বেরিয়ে প'ড়লাম। নীল পোশাক-পরা ছোট্ট মেয়েটি আমাদের সংগে কিছুদূর অবধি এগিয়ে এলো—বুড়োকে সংগে ক'রেই বাড়ি ফিরবে। বুড়ো কিন্তু তাকে দেখতে পায়নি। আমার কাঁধে ভর ক'রে সে সগর্বে চ'লছিলো—ঠিক যুবকের মতোই। দরজায় দাঁড়িয়ে মামেৎ চেয়ে চেয়ে দেখছে; আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে তার সারা মুখ। আমাদের দেখতে পেয়ে মাথা নেড়ে সে যেনো আপনমনেই ব'লছিলো: আমার বুড়ো এখনো বেশ হাঁটতে পারে; আর ভাবনা নেই।

দুই সরাই

জুলাইয়ের এক বিকেল বেলা ; নীম্ থেকে ফিরছিলাম। অসহ্য গরম। ঝলসানো পথ প'ড়ে আছে যতদূর চোখ যায়,—দুপাশের জলপাই বীথি ও ছোটো ছোটো ওকসারির মাঝ দিয়ে ধূলি ধূসরিত পথ বিস্তৃত। উপরে সমস্ত আকাশ আলোর বন্যায় ডোবানো, সূর্য্য নিষ্প্রভ। এক-টুকরো ছায়া নেই কোথাও,—সেই হাওয়ার মৃদু নিশ্বাস। চারদিকে শুধু উষ্ণ হাওয়ার কম্পন, গঙ্গাফড়িংএর তীক্ষ্ণ সুর, কানে তালা লাগানো মত্ত সুর, ব্যস্ত সুর। সে যেন এই দিগন্তব্যাপী দীপ্তির সুর-শিহরণ! এই উজ্জল মরুপথে দুঘণ্টা ধ'রে হেঁটে চলেছি। হঠাৎ সামনে দূর ধূলি পথের উপর স্পষ্ট হ'য়ে জেগে উঠলো কয়েকটি শাদা ঘর। জায়গাটার নাম স্যাঁ-ভঁ্যাসাঁ-র ঘোড়া বদল খানা। পাঁচটা কি ছটা লম্বা লম্বা ঘর, লাল ছাতের কয়েকটি গোলাঘর, জলশূন্য একটি চৌবাচ্চা, দু একটা ডুমুর গাছের ঝোপ। এই ছোটো গাঁয়ের প্রান্তে বড়ো দুটো সরাই,—রাস্তার দুদিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

সরাই দুটির সান্নিধ্য স্বতই চোখে পড়ার মতো। একদিকে মস্তো বড়ো একটা দালান,— জীবনের স্পন্দনে, হৈ-হল্লায় মুখরিত! সমস্ত জানলা কবাট খোলা, সামনে শ্রান্ত যাত্রীদল, ঘর্মক্লান্ত ঘোড়াগুলি বল্গার বন্ধন থেকে মুক্ত। যাত্রীরা তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিচ্ছে দেয়ালের ছোট্ট সংক্ষিপ্ত ছায়ায়—রাস্তার উপরে বসেই। সমস্ত আঙিনায়ই গাড়ী আর ঘোড়ার ভিড়। ছায়ায় বসে গাড়োয়ানেরা শান্ত সন্ধ্যার প্রতীক্ষা কচ্ছে। চীৎকার, গালিগালাজ, টেবিলের উপর ক্রমাগত ঘুষির শব্দ,

গ্লাসে গ্লাসে ঠুনঠুন আওয়াজ, বিলিয়ার্ড বলের খস্‌খস্‌ শব্দ, ছিপি খোলার কচ্‌কচ্‌—এবং তারি ভেতর দিয়ে জেগে উঠছে হৈ-হল্লার রব। আমুদে-গলার একটি লোক এতো উঁচু সুরে গান গাইছে যে কেঁপে কেঁপে উঠছে সরাইর জানলা কবাট পর্যন্ত! গাইছে সে :

দিগন্তে জাগে রঙীন প্রভাত,
আসে সুন্দরী মার্‌গাটন ;
সরু কাঁখে নিয়ে রূপোর কলসী
চলে সে কুয়োর পথে।

উল্টো দিকের সরাইটা কিন্তু নিস্তব্ধ নীরব,—নির্বাসিত পুরীর মতোই! দোরের চৌকাঠের নীচে গজিয়েছে লম্বা লম্বা ঘাস, জানলার কাচ ভাঙা, দোরের উপরেই এসে পড়েছে একটা কদাকার ডাল!—রাস্তা থেকে দোরের সামনেটা পর্যন্ত পাথর ছড়ানো ; সব কিছুই দারিদ্র্যে জর্জরিত। এতো করুণ যে এখানে থেমে প'ড়ে একগ্লাস চা খাওয়াটাও যেনো একান্ত করুণার কাজ!

ঢুকেই দেখলাম মস্তো বড়ো একটা কোঠা,—নির্জন নির্বাসিত, বিষণ্ণ স্তব্ধ। পর্দাহীন তিনটে জানলার মধ্য দিয়ে আলো এসে পড়ায় আরো নির্জন ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কয়েকটি হাড়জাগা টেবিল, উপরে ধূলিপড়া ভাঙা গ্লাস, ভাঙা একটা বিলিয়ার্ড টেবিল, চার কোণের চারটে পকেট যেনো হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চাইছে! একটা হলদে রঙের খাটিয়া, একটা পুরোনো ডেস্ক—অস্বাস্থ্যকর অভদ্র গরমের মধ্যে প'ড়ে প'ড়ে ঝিমুচ্ছে সব। আর মাছি, সর্বত্র শুধু মাছি! এমন অগণিত অসংখ্য প্রাণী জীবনেও দেখিনি আর! ছাতে দেয়ালে জানলার কাচে ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে! দোর খুলতেই একটা গুনগুনানি সুর,—অসংখ্য ডানার ঝংকার। আমি যেনো এক মৌচাকেই ঢুকতে যাচ্ছি!

ঘরটার প্রান্তে জানলার অলিন্দে একটি মেয়েলোক কাচের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে,—উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে বাইরে। আমি দু' দুবার ডাক দিল'ম তাকে—

"এই, কে আছেন ? ভেতরে আছেন কেউ ?"

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো সে, দারিদ্র্যপীড়িত একটি কিষাণ মেয়ে, মুখের চামড়া কুঁচকে রেখায়িত হ'য়ে আছে,—মাটির মতো ফ্যাকাশে-মলিন তার রঙ্, পোশাক-প্রান্তে বিশ্রী ঝালর লাগানো। আমাদের পাড়ার বুড়ীরা যে পোশাক প'রে থাকে। সে কিন্তু বুড়ী নয় মোটেই,-দিন রাত কেঁদে কেঁদেই সে বুড়ী হ'য়ে গেছে।

"কাকে চান আপনি ?"—চোখ মুছে সে এসে জিজ্ঞেস করলো।

"একটুখানি ব'সে কিছু একটা খাবো।"—বিস্ময়ে সে একদৃষ্টে হা করে তাকিয়ে রইলো নিস্পন্দ নিশ্চল,— আমার কথা যেনো সে বুঝতেই পারে নি।

"এটা কি সরাই নয় ?"

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো,—

"হ্যাঁ সরাই,— সরাই বলতে পারেন। কিন্তু উল্টোদিকের ঐটেয় যাচ্ছেন না কেন ? সবাই তো যায়। ঐটেই তো বেশ ফিট্‌ফাট্, কেমন হাসি খুসিতে ভরা।"

আর কিছু বলবার আগেই আমি টেবিলের কাছে ঘনিয়ে বসলাম।

আমি যে সত্যি সত্যি বসেছি নিশ্চিত এই ধারণা হ'লে উঠে সে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা সুরু ক'রে দিলো— দোর খুললো, বোতল নামালো, গ্লাসগুলি ধুয়ে মুছে নিলো,—মাছিগুলিকে বারবার তাড়া লাগিয়ে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো, অতিথিকে আপ্যায়ন করা বিশেষ একটা আয়োজনের ব্যাপার। মাঝে মাঝে এই বেচারী মেয়েটি

দাঁড়িয়ে প'ড়ে হতাশায় মাথা আঁকড়ে ধরে দুই হাতে,—যেনো সে কোনো দিনই আর তার এই আয়োজন শেষ ক'রে উঠতে পারবে না।

এবারে সে পেছনের ঘরে গেলো, আমিও ব'সে ব'সে শুনছিলাম। বড়ো বড়ো চাবিগোছা তালায় লাগাচ্ছে সে, রুটির বাক্স খুলছে, ঝাঁট দিচ্ছে, ধুয়ে মুছে নিচ্ছে কাপ প্লেট্।

মিনিট পনেরো পরে আমার সামনে দেওয়া হলো পাথরের মতো শক্তো এক প্লেট মনক্কা, এক টুকরো কালো পুরোনো রুটি, আর এক বোতল টক মদ।

"এই নিন!"—অদ্ভুত সেই মেয়েটি বললো, ও জানলার কাছে তার আগের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো।

খেতে খেতে আমি তাকে কথা বলাতে চেষ্টা করলাম,—

"এখানে বোধ হয় প্রায়ই লোক আসে না, তাই না?"

"না, কেউ আসে না। প্রথম যখন আমরা এখানে এসেছি সেদিন ছিলো সবই একেবারে অন্যরকম। এখানেই ঘোড়া বদলি করে নেবার ব্যবস্থা ছিলো; হাঁস শিকারের ঋতুতে দরকারী সব কিছু জোগাড় ক'রে দিতাম আমরাই, সারা বছর ধ'রেই ভাড়া খাটাতাম গাড়ী; কিন্তু সামনের ঐ প্রতিবেশীরা ব্যবসা সুরু করবার পর থেকেই সব ভেঙে গেলো আমাদের। সবাই এখন ঐ সরাইতে যাওয়াই পছন্দ করে! আমাদের এখানে সবারই বিশ্রী লাগে। অবিশ্যি এখানটা ভালো লাগার মতোও নয়,—সে সত্যি। দেখতেও আমি ভালো নই, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে আমার, আমার মেয়ে দুটিও মারা গেছে, আর ঐ সামনেই—দিনরাত কাটায় তারা হৈ হল্লা ক'রে। একটি মেয়ে ঐ সরাইয়ের পরিচালিকা। সুন্দরী সে, সুন্দর লেস তার পোশাকে, গলায় তিনছড়া সোনার মালা।

যাত্রীগাড়ীর গাড়োয়ান তার প্রণয়ী,—কতোগুলি ভ্রষ্টা মেয়ে রেখেছে সে পরিচারিকা, কাজেই ভিড় লেগে যায় খরিদ্দারের। বেজস্, রেদেস্সা, ঝঁকিয়ের যুবকদের হাত করেছে সে, গাড়োয়ানেরা তার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার লোভে এই পথ ঘুরে যায়। আর আমি এখানে পড়ে আছি নিঃসংগ একেলা, দিন দিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে ম'রে যাচ্ছি।"

সবকথা বলছিলো সে উদাসীন স্বরে—জানলার কাচের উপরে তার মাথাটা রেখে। স্পষ্টতই সামনের সরাইতে কিছু একটা তার মন টেনে রেখেছে।

হঠাৎ রাস্তার ওধারে ভয়ানক একটা হৈ হল্লা। যাত্রীরা বিদায় নিচ্ছে, পথের ধূলি উড়ছে পিছে পিছে, চাবুকের শব্দ, গাড়োয়ানের বাঁশী। সেই মেয়েরা দোরে ছুটে এসে বলছে—"বিদায়, বিদায়!" আর এই সব কিছু ছাড়িয়ে সেই জোরালো কণ্ঠটি আবারো সুরু করলো তার গান, আগের চেয়েও জোরে—

রূপোলি কলসী কাঁখে
চলে সে কুয়োর পাশে,
দেখেনা তাহারি কাছে
তিনটি যোদ্ধা আসে।

ঐ কণ্ঠের গান শুনে সরাইয়ের এই মেয়েটির সর্বাংগ কাঁপতে লাগলো, আমার দিকে ফিরে সে চাপাগলায় বললো ;

"ঐ শুনছেন না? ঐ আমার স্বামী, খুব ভালো গান, না?"

বিমূঢ়ের মতো আমি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম, "সে কি, তোমার স্বামী! তা হ'লে সেও কি ওখানে যায়?"

কথা বলতে যেনো তার সারা বুক ভেঙে যাচ্ছিলো,—তবু শান্তসুন্দর সুরে ভদ্রভাবেই ব'লতে লাগলো সে—

"তা ছাড়া আর কি হবে! দেখুন, পুরুষদের ধরণই অমন,—কান্না তারা দেখতেই চায় না। আমিও দিনরাত কাঁদি শুধু—আমার মেয়ে দুটি মারা যাওয়ার পর থেকেই; এই বড়ো বাড়ীটাও পড়ে থাকে বিষণ্ণ, নির্জন,—কেউ আসে না এখানে। কাজেই যখন সে ক্লান্ত ও বিরক্ত হ'য়ে ওঠে, তখন আমার হতভাগ্য জোস্, আমার স্বামী জোস্ই চলে যায় রাস্তার ওপারে। কি সুন্দর তার গলা, আর্লের মেয়েটি তাকে দিয়ে গান গাওয়ায়। ঐ শুনুন আবারো গান ধরেছে সে।"

আর সেইখানেই সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো। থর থর ক'রে কাঁপছে তার সারা দেহ, হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়েছে সে, চোখের জল ঝর ঝর ক'রে পড়তে লাগলো গাল বেয়ে বেয়ে। তাকে তখন দেখাচ্ছিলো এমন করুণ, এবং এমন কুৎসিত! তারি জোস্‌কে আর্লের সেই মেয়েটির কথায় গান গাইতে শুনে সে আর বুক বেঁধে থাকতে পারছিলো না। ওদিকে তখন উঁচু পর্দায় চলেছে সেই গান—

"প্রথম যোদ্ধা বলে এসে তার কাছে,—
এই যে প্রেয়সী, আছো তো ভালো ?"

শেষপাঠ

সেদিন সকালে স্কুলে যেতে ভয়ানক দেরি হ'য়ে গেলো। তাই বকুনি খাওয়ার ভয়ও হচ্ছিলো খুবই। বিশেষ ক'রে, মঁস্যো আমেল্ ব'লে দিয়েছেন, আজ পার্টিসিপ্‌ল-এর পড়া জিজ্ঞেস ক'রবেন তিনি। আমি তো তার একবর্ণও বুঝতাম না। হঠাৎ মনে হ'লো, স্কুল পালিয়ে বাইরেই দিন কাটিয়ে দিই না কেন! চমৎকার উজ্জ্বল দিনটা, বনের ঐ প্রান্তে শোনা যাচ্ছে পাখীর কিচিরমিচির গান। কাঠের কারখানার পেছনে খোলা ময়দানে প্রুশীয় সৈন্যেরা ড্রিল ক'রছে। পার্টিসিপ্‌লের 'রুল্' মুখস্ত করার চাইতে এটা সত্যিই অনেক বেশী লোভনীয়। কিন্তু এই প্রলোভন জয় করার মতো মনের জোর ছিলো আমার। তাই স্কুলের দিকেই ছুটে চ'ললাম।

টাউনহল পেরুতে গিয়ে দেখি, নোটিশবোর্ডের সামনে মস্তো ভিড় জ'মে গেছে। ওখান থেকেই এসেছে এই গত দু'বছরের যত দুঃসংবাদ—যুদ্ধে পরাজয়, নতুন আইন কানুনের খস্‌ড়া, সেনাপতির কঠোর আদেশ—সমস্ত কিছুই। যেতে যেতে ভাবছিলাম, ব্যাপার কী।

আমাকে জোরে ছুটতে দেখে কর্মকার ভাখ্‌টর্ বললো—"খোকা অতো দৌড়ে যেও না; অনেক আগেই স্কুলে পৌছুতে পারবে তুমি।" সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নোটিশটা প'ড়ছিলো। ভাবলাম, আমার সংগে ঠাট্টা ক'রছে বোধ হয়, তাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে পৌছুলাম মঁস্যো আমেলের বাগানে।

বরাবর স্কুল ব'সতেই সব মিলে ভয়ানক একটা গোলমাল সুরু হ'য়ে

যায়ঃ কেবল দেরাজ খোলা দেরাজ বন্ধ করার শব্দ, সমস্বরে বই পড়ার গণ্ডগোল আর টেবিলের উপর মাষ্টার মশাইয়ের মস্তো রোলারের ঠকঠক! রাস্তা থেকেও সেই সোরগোল শোনা যেতো। কিন্তু আজ সবই এতো নিঃশব্দ, নীরব। পথে পথে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম এই গণ্ডগোলের ফাঁকে কেউ না দেখতে পায় এমনি ভাবে আমার ডেস্কে গিয়ে ব'সে প'ড়বো। কিন্তু রবিবারের সকালের মতোই সবকিছুই নীরব আজ। জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম, আমার সংগীরা তাদের নিজ নিজ জায়গায় ব'সে প'ড়েছে, আর মঁস্যো আমেল শুধু এদিক ওদিক পায়চারী ক'চ্ছেন ; হাতে তাঁর সেই লোহার ভয়ংকর রোলার। অন্যান্য দিন আমিই দোর খুলে সবার আগে ক্লাশে ঢুকে প'ড়তাম, তাই বুঝতেই পারছো, আজ আমার কেমন ভয় ও লজ্জা হ'তে লাগলো।

কিন্তু তেমন কিছুই হ'লোনা। মঁস্যো আমেল্ আমাকে দেখতে পেয়ে সস্নেহে ব'ললেন, "যাও শিগ্‌গির বসোগে,ফ্রাণ্ট্‌স্। তোমাকে ছাড়াই আমরা সুরু ক'রছিলাম।"

বেঞ্চি পেরিয়ে আমার ডেস্কে এসে ব'সলাম। কিছুটা ভয় সামলে ওঠার পরেই চোখে প'ড়লোঃ মাষ্টার মশাই আজ প'রে এসেছেন তাঁর সুন্দর সবুজ কোটটা ও বর্ডার তোলা দামী সার্টটা। সিল্কের কালো ছোট্ট টুপিটার উপরে কেমন সূচীকাজ। স্কুল পরিদর্শন বা পুরস্কার বিতরণের দিন ছাড়া তো তিনি এগুলো পরেন না কক্ষনো। সবচাইতে আশ্চর্য হ'লাম আর একটা জিনিষ দেখে,—দেয়ালের ওপাশে গ্রামের লোকেরা পর্যন্ত আমাদেরই মতো চুপ ক'রে ব'সে আছে। ঐ যে বুড়ো হাউজর! মাথায় তার সেই তিনকোণা টুপিটা। তারপর পূর্বতন মেয়র, ভূতপূর্ব পোষ্টমাষ্টার, আরও অন্যান্য কয়েকজন লোক। সবাই যেনো বিষণ্ণ, বিমূঢ়। হাউজর তার হাঁটুর উপরে একটা

পুরোনো 'প্রাইমার' বই খুলে রেখেছে, আর পৃষ্ঠার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে একে একে।

বিস্মিতের মতো এই সমস্ত কিছুই দেখছিলাম। মঁস্যো আমেল এবারে চেয়ারে এসে ব'সলেন। আগের মতোই কোমল গম্ভীর স্বরে বললেন তিনি, "প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, আজকেই তোমাদের শেষদিনের মতো পড়িয়ে যাচ্ছি। বেলিন থেকে আদেশ এসেছে: আলসেস্ ও লোরেন্ প্রদেশের বিদ্যালয়সমূহে একমাত্র জার্মান ভাষাই শিক্ষা দিতে হবে। কালই তোমাদের নতুন মাষ্টারমশাই আসছেন। শেষদিনের মতো ফরাসী পাঠ নাও তোমরা। চুপ ক'রে মন দিয়ে শোনো।"

এই কথা ক'টি আমার কানে এসে বাজলো বজ্রধ্বনির মতোই।

ও, দুর্বৃত্ত জার্মান দস্যুরা বুঝি এই কথাই নোটিশ বোর্ডে লিখে রেখেছে!

আমার ফরাসী শিক্ষার শেষ দিন! শুধু একটুখানি লিখতেই কেন বা শিখলাম! আর তো কখনো শিখতে পাবো না। এখানেই তা হ'লে সব শেষ ক'রে দিতে হবে! পড়া নষ্ট ক'রে কতদিন পাখীর ডিম চুরি ক'রে এনেছি, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়িয়েছি। তাই মনে ক'রে কী যে দুঃখ হতে লাগলো আমার! একটু আগেও-বইপত্তরগুলো মনে হচ্ছিলো বাজে একটা বোঝার মতো। আর এখন এই পাঠ্য ব্যাকরণ, মহাপুরুষদের জীবনী—সবই আমার কাছে এগিয়ে এলো একান্ত বন্ধুজনের মতোই। ওদের আর মঁস্যো আমেল্-কে ছেড়ে থাকা যে অসম্ভব।

কালকেই তিনি চ'লে যাচ্ছেন, আর কখনো তাঁকে দেখতে পাবো না এই কথা মনে প'ড়তেই ভুলে গেলাম তাঁর সমস্ত কড়াশাসন।

হায়, আমার হতভাগ্য শিক্ষক! এই শেষ ফরাসী পাঠের প্রতি

সম্মান প্রদর্শনের জন্যই বুঝি তিনি রবিবারের বিশিষ্ট পোশাকটি প'রে এসেছেন। এখন বুঝতে পারলাম, কেনই বা গ্রামের বুড়োরা ওখানে ঘরের পেছনে ব'সে রয়েছে। স্কুলে বেশী পড়াশুনো ক'রতে পারেনি ব'লে আজ তারাও অনুতপ্ত। চল্লিশ বছর ধ'রে নিঃস্বার্থভাবে কাজ ক'রে এসেছেন আমাদের এই মাষ্টারমশাই; তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যই তারা সমবেত হ'য়েছে। যে দেশ তাদের হাত থেকে চ'লে গেলো আজ অন্যের হাতে—তাঁর প্রতিও তারা সম্মান জ্ঞাপন ক'রবে।

ব'সে ব'সে এই সব ভাবছিলাম। এমন সময় মাষ্টারমশাই আমার নাম ডাকলেন। এবারে আমার পড়া বলার পালা। পার্টিসিপ্‌লের সেই খটমট 'রুল'গুলি যদি সেদিন স্পষ্ট উঁচু গলায় নির্ভুল ক'রে ব'লে দিতে পারতাম, তাহ'লে আমার সর্বস্ব দিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হ'তাম না। কিন্তু প্রথম অক্ষরেই সব গুলিয়ে গেলো। ডেস্কের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুক ধুক ধুক ক'রছে, মুখ তুলতেও সাহস হচ্ছে না। মঁস্যো আমেল্ ব'ললেন:

"ফ্রান্ট্‌স্, তোমাকে কিছুই ব'লবো না আমি। নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পারবে। আজ দেখছো তো! আগে ব'লতাম, ঢের সময় প'ড়ে আছে, ওটা কাল শিখে নেবো। তার ফলেই তো আজ এই দশা! আল্‌সেসের সব লোকেরই এই একটা প্রধান দোষ। আজকের কাজ পরশুর জন্য রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে তারা। আর এখন ঐ প্রুশীয় সৈন্যেরাও তো ব'লবার সুযোগ পাবে: কি আশ্চর্য, মাতৃভাষায় কথা ব'লতে পারো না, লিখতে জানো না,—নিজেদের ফরাসী ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা করেনা? কিন্তু ফ্রান্ট্‌স্, এর জন্য তুমিই একমাত্র দোষী নয়। আমরা সবাই এর জন্য দায়ী।

"তোমার শিক্ষা বিষয়ে তোমার বাবা-মা মাথা ঘামান না মোটেই। কোনো কল বা কারখানায় কাজ ক'রে দুপয়সা রোজগার করো এই তাঁরা চান। আর আমি? আমিও তো নিজে দোষী। পড়া নষ্ট ক'রিয়ে কতোদিন তোমাকে আমার ফুলচারায় জল দিতে পাঠিয়েছি। আর, যখনই মাছ ধ'রতে যাবার ইচ্ছে হ'য়েছে আমার, তৎক্ষণাৎ ছুটি দিয়ে দিয়েছি অবাধে।"

তারপর এক এক ক'রে ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে তিনি ব'লে যেতে লাগলেন। "পৃথিবীর মধ্যে ফরাসীই হ'চ্ছে সব চাইতে সহজ, সরল, স্বচ্ছ, সুন্দর ভাষা। এই মাতৃভাষাকে প্রাণের মতো রক্ষা ক'রবো আমরা, জীবন থাকতেও এভাষা কক্ষণো ভুলবো না। কারণ, দাসত্ব-শৃংখলে বন্দী একটা জাতি যতোদিন পর্যন্ত নিজের মাতৃভাষাকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে ততোদিনই হাতে থাকে তার মুক্তির চাবি।" এবারে ব্যাকরণ খুলে সেদিনকার পড়া প'ড়তে শুরু ক'রলেন তিনি। কি আশ্চর্য, তার প্রত্যেকটি কথা কতো অনায়াসেই না বুঝতে পারছিলাম। সব কিছুই লাগলো জলের মতো সহজ। এতো মনোযোগ দিয়ে আর কখনো শুনিনি, আর এতো ধৈর্য নিয়ে মাষ্টার মশাইও কোনো দিন আমাদের পড়া বুঝিয়ে দেননি। তার জ্ঞানের সবটুকুই যেনো তিনি যাবার আগে আমাদের একবারেই দিয়ে যাবেন।

ব্যাকরণ পড়া শেষ হ'লে আমরা সবাই শ্রুতিলিপি লিখলাম। মঁস্যো আমেল্ সেদিন আমাদের জন্য কতগুলি নতুন হস্তলিপি নিয়ে এসেছিলেন। তার উপরে গোল গোল সুন্দর অক্ষরে লেখা শুধু: ফ্রান্স, আলসেস্, ফ্রান্স, আলসেস। ছোটো ছোটো নিশানের মতোই ওগুলো দেখাচ্ছিলো ঘরের চারদিকে। সবাই আপন মনে লিখে যাচ্ছে। সমস্ত ক্লাশটাই নিঝুম, নীরব। কানে আসছে কেবল লেখার

একটানা খস্‌খস্‌ শব্দ। তা যদি দেখতে একবার! হঠাৎ পাশ দিয়ে কয়েকটা পাখী উড়ে চ'লে গেলো। কিন্তু কেউ সেদিকে তাকিয়েও দেখলো না। এমন কি, ছোট্ট ছেলেমেয়েরাও নয়। তারা শুধু মাছের ছবির উপরে মক্‌শো ক'রছিলো। সেও যেনো ফরাসী ভাষা! ছাতে ব'সে ঘুঘুরা আস্তে আস্তে শিস্‌ দিচ্ছিলো আর আমি ভাবছিলাম ঃ

বিজয়ী শত্রুরা এসে ওদের দিয়েও কি জার্মান ভাষায় গান গাওয়াবে?

লেখা থেকে চোখ তুলে দেখলাম, মঁস্যো আমেল্‌ চেয়ারে ব'সে আছেন,—নিশ্চল, নিস্পন্দ; ছোটো স্কুলঘরটির সবকিছু ভালো ক'রে দেখবার জন্যই যেনো চারদিক তাকাচ্ছেন। একবার ভাবো, চল্লিশটি বছর ধ'রে তিনি সেই একই জায়গায় আছেন। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঐ বাগান, আর তার সামনেই ক্লাশ, সবই ঠিক আগের মতো। একমাত্র বেঞ্চি ও ডেস্কগুলোর পা-গুলোই ভাঙা। বাদামচারাগুলি বেশ বড়ো হ'য়ে উঠেছে, তাঁর নিজের হাতে পোঁতা আঙুর লতারাও জানলা জড়িয়ে জড়িয়ে ছাতের দিকে মুখ বাড়িয়ে আছে! এই সব কিছু ছেড়ে যাবার দুঃখে তাঁর বুক ফেটে কান্না আসছিলো। উপর তলায় তাঁর বোন বাক্স-পেঁট্‌রা গোছাচ্ছে, সে শব্দও কানে আসছে। কালকেই সব ছেড়ে যেতে হবে।

কিন্তু তবুও তিনি শান্তভাবে প্রত্যেকের লেখারই শেষ কথাটি পর্যন্ত মন দিয়ে শুনলেন। শ্রুতিলিখনের পর ইতিহাস পড়ানো হ'লো। আর তখন ছোট্ট ছেলেমেয়েরাও সুর ক'রে প'ড়তে লাগলো ঃ বি—এ—বে, বি—ই—বি, বি—আই—বাই, বি—ও—বো, বি—ইউ—বিউ। ঘরের পেছনে বুড়ো হাউজর-ও চোখে চশমা এঁটে দু হাত

দিয়ে প্রাইমার বইটা তুলে ধরেছে। তাদের সংগে বানান ক'রে ক'রে প'ড়ে যাচ্ছে সে।

শিখবার জন্য তারও যেনো আজ কতো আগ্রহ। আবেগের আতিশয্যে গলা তার কেঁপে যাচ্ছে। আর সেই মজার স্বর শুনে আমাদের সবারই হাসি পাচ্ছিলো, সংগে সংগে কান্নাও আসছিলো। এখনো কেমন স্পষ্ট মনে প'ড়ছে সেই শেষ দিনের কথা।

গির্জায় বারোটার ঘণ্টা বেজে উঠলো, সুরু হ'লো প্রার্থনা গান। এবং সেই মুহূর্তেই ঠিক আমাদের জানলার নীচে প্রুশীয়দের রণভেরী ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো।—ড্রিল থেকে ফিরছে সব। মঁস্যো আমেল্ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—বিষণ্ণ, মলিন। আর কোনোদিন আমি তাঁকে এমন দীর্ঘ ও শীর্ণ দেখিনি।

"আমার প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, আমি—আমি তোমাদের,"—ব'লতে না ব'লতেই গলা তার ধ'রে এলো, আর ব'লতে পারলেন না।

তারপর তিনি একটুকরো চক্ নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে এলেন এবং সমস্ত প্রাণের মতো বড়ো ক'রেই বোর্ড জুড়ে লিখে দিলেন—

"জয়, ফ্রান্সের জয়!"

দেয়ালে মাথা রেখে দাঁড়ালেন তিনি—একেবারে নিস্পন্দ, নীরব; এবং হাত দিয়ে ইংগিত ক'রে জানালেন, "স্কুল শেষ হ'লো, এবারে যেতে পারো।"

সোনার মাথাওয়ালা লোক

এক সময় ছিলো এক মানুষ। তার মাথা ছিলো সোনায় গড়া। হ্যাঁ, সত্যি খাঁটি সোনার ছিলো সেই মাথা। সে যখন এই পৃথিবীর মাটিতে এসে জন্ম নিলো, ডাক্তাররা একবারও ভাবেনি সে বাঁচবে। তবু সে কিন্তু বেঁচে উঠলো; দিন দিন ব'ড়ো হ'তে লাগলো—রোদে জলে গাছ যেমন ঝাঁকিয়ে ওঠে। একমাত্র তার মস্তো মাথাটার ভার সে কিছুতেই সামলে উঠতে পারতো না। হাঁটতে গিয়ে সবকিছুতেই কেবল ঠোক্কর খেতো। ভারী করুণ সে দৃশ্য! একদিন সে একটা সিঁড়ির মাথা থেকে গড়াতে গড়াতে প'ড়ে গিয়ে ধাক্কা খেলো একটা মার্বেলের সিঁড়িতে। খুলিটার আকার হ'য়ে গেলো একটা ধাতুপিণ্ডের মতোই। সবাই ভাবলো, ম'রে গেছে সে! শেষে তাকে তুলতে গিয়ে তারা দেখতে পেলো: তার সোনালী চুলের মাঝে জমাট বেঁধে আছে দু'তিন ফোঁটা সোনা! তার মাথা যে সোনায় ভরা এই ভাবেই তার বাবা মা প্রথমে জানতে পেলো।

ব্যাপারটা বাইরে অন্য কেউ জানতো না, বেচারার মনেও নিজের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই জাগেনি। একদিন শুধু সে তার মাকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলো, "মা, রাস্তায় অন্য ছেলেদের সংগে আমাকে আর খেলতে দাওনা কেন?"

"তারা তোমাকে চুরি ক'রে নেবে যে, আমার সোনার মাণিক।" মা উত্তর জানায়।

সেই থেকে ছেলেটির ভীষণ ভয় হ'তে লাগলো, কখন কে তাকে চুরি ক'রে নেয়। আজকাল চুপটি ক'রে সে আপন মনে বাড়িতে ব'সেই খেলা করে, অস্বস্তিভরে এঘর থেকে ওঘর ঘুরে বেড়ায় শুধু।

ছেলেটির বয়স আঠেরো হ'লে তার বাবা মা একদিন প্রকাশ ক'রলো যে দৈবের কাছ থেকে সে লাভ ক'রেছে ভয়ানক এক সম্পদ। এতদিন তারা যে তাকে লালনপালন ক'রে বড়ো ক'রে তুলেছে, রক্ষা ক'রেছে নানা বিপদের হাত থেকে তারই প্রতিদান হিসেবে তারা তার কাছে কিছুটা সোনা চায়। ছেলেও অমনি সেখানে বসেই (—কেমন ক'রে তা' অবিশ্যি পৌরাণিক কাহিনীটিতে যথাযথ বর্ণিত হয়নি—) মাথার ভেতর থেকে বের ক'রে আনলো একটা সোনার ডেলা,—মস্তো একটা সুপুরীর মতোই দেখতে। ছেলে গর্বভরেই মায়ের পায়ের উপরে রাখলো সেই স্বর্ণপিণ্ড। মস্তিষ্কের এই অপূর্ব সম্পদে সে বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে; উন্মাদ আবেগে, শক্তিমত্ত উল্লাসে বাবার বাড়ি ছেড়ে চ'লে যায়—বিধিদত্ত ধন উড়িয়ে চলে দেশে দেশে।

রাজার হালেই থাকে সে, টাকা বৃষ্টি করে মনের খুশিতে। লোকে ভাবে অফুরন্ত তার ধনভাণ্ডার। কিন্তু সত্যি ব'লতে কি, দিন দিন মগজ তার কমতে লাগলো। ক্ষ্যাপার মতো যথেচ্ছা ঘোরাঘুরির পর একদিন এই হতভাগা প'ড়ে রইলো নিঃসংগ, একা,—চারদিকে শুধু নিষ্প্রভ আলো আর অতীত ভোজ উৎসবের দু' একটুকরো ছবির ঝলক। হঠাৎ সে শংকিত হ'য়ে ওঠে—তার মাথার স্বর্ণপিণ্ডের মাঝখানটায় সৃষ্টি হ'য়েছে এক বিরাট ফাঁক। এবার তো থামতে হয়!

এই থেকে তার জীবনে এলো এক অদ্ভুত পরিবর্তন। সোনার মাথাওয়ালা লোকটা ঠিক ক'রলো, অন্য কোথাও গিয়ে পরিশ্রম ক'রে নিরালায় শান্তির জীবন কাটাবে। কৃপণের মতোই সে ভীত সন্দিগ্ধ হ'য়ে ওঠে, কোনো কিছুতেই আর তার লোভ নেই; ভুলে গেছে সেই অপূর্ব সম্পদের কথা! ওর কিছুই আর স্পর্শ ক'রবে না সে। দুঃখের বিষয়, তার এই নিঃসংগ জীবনে কোথা থেকে জুটলো এসে আর এক বন্ধু। সে তার গুপ্তকথা সবই জানতো।

একদিন মাঝরাতে হঠাৎ লোকটা জেগে উঠলো—মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। ভয়ে ভয়ে বিছানার উপরে উঠে ব'সলো; চাঁদের আলোয় সে স্পষ্টই দেখতে পেলো: তার বন্ধু জামার নীচে কী যেনো লুকিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি স'রে যাচ্ছে।

আর একটুকরো মগজও চুরি হ'য়ে গেলো!

এর কিছুদিন পরে এই সোনার মাথাওয়ালা লোকটা প্রেমে প'ড়ে যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে ফেললো। একটি সুন্দরী মেয়ের সংগে প্রেমে প'ড়ে গেলো; মেয়েটিও তাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসলো বটে তবে তার কাছে আরো প্রিয়বস্তু ছিলো কোমল শয্যা, দামী সজ্জা, হাঁসের পালকশোভিত নীল সাটিনের জুতো।

আধো-পুতুল, আধো-পরীর মতো এই জীবটির ফরমাস্ যোগাতেই ফতুর হ'য়ে যায় তার মস্তিষ্কের সমস্ত স্বর্ণসম্পদ। কিছু দেখলেই লুব্ধ হ'য়ে ওঠে সে, স্বামীও 'না' ব'লতে পারে না। এমন কি, স্ত্রী দুঃখ পাবে ব'লে বরাবর তার কাছে সে তার ভাগ্যের এই মর্মান্তিক রহস্যের কথা গোপন ক'রে যায়।

"তবে তো খুবই ধনী আমরা।" স্ত্রী বলে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, খু-ব ধনী।"—বেচারাও উত্তর দেয়।

পরীর মতো সুন্দরী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সে মুচকি হাসে। নিজের অজ্ঞাতসারেই স্ত্রী তার মাথাটি খেয়ে চলে। মাঝে মাঝে লোকটা শংকিত হ'য়ে ওঠে, কৃপণের মতোই থাকতে চায়। কিন্তু ইতিমধ্যেই স্ত্রী হয়তো নাচতে নাচতে এসে ব'লছে:

"তুমি তো এতো বড় লোক। আমাকে খু-ব দামী একটা কিছু কিনে দাও না!"

স্বামীও তাকে খু-ব দামী একটা জিনিস কিনে দেয়।

এইভাবে কেটে গেলো বছর দুই। তারপর হঠাৎ একদিন সকাল বেলা তার স্ত্রী মারা যায়—কেন কেউই ব'লতে পারে না। ঠিক একটি পরীর মতোই পৃথিবী থেকে চ'লে যায় কোন্ নিরুদ্দেশে! এদিকে লোকটার মাথার সোনাও ফুরিয়ে এসেছে। যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো তা দিয়েই সে খুব ধুমধাম ক'রে স্ত্রীকে কবর দিলো। ঘণ্টা বাজছে, কালো সিল্কে ঢাকা গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে, সুন্দর সুন্দর ঘোড়াগুলি জড়ো হ'য়েছে শবাধারের পাশে, মখমলের শবাচ্ছাদনের উপর জ্বল-জ্বল ক'রছে রূপো, মণিমুক্তো—তবু কিছুতেই তার মন ওঠে না। সোনা দিয়ে এখন আর কী হবে! যা ছিলো তা সবই সে দান ক'রলো নানা গির্জায় ও গরীব দুঃখীদের। অসংকোচে ছড়িয়ে দিলো সব জায়গায়। কবর থেকে ফিরে এসে সে দেখে তার সেই বিচিত্র মগজে এক ফোঁটা সোনাও আর নেই, ফাঁকা খুলিটা প'ড়ে রয়েছে শুধু।

আজকাল সে কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় পাগোলের মতো। চোখের কোলে কালো দাগ, চলে মাতালের মতো ট'লতে ট'লতে। রাতে বাজারে দোকানের সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকে হাবার

মতো। শো-কেসের ভেতরে মণিমুক্তোর নানারকম অলংকার ও অন্যান্য জিনিষপত্তরগুলি আলোতে ঝল মল ক'রে ওঠে। কী যেনো ভাবে সে! হাঁসের পালক-শোভিত নীল সাটিনের জুতোর দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টিতে। "জানি এগুলো কার মনে ধরতো, ঠিক জানি আমি!"—ব'লতে ব'লতে মুচকি হাসে। জুতো জোড়া কিনবার জন্যে সটান্ ঢুকে পড়ে দোকানের ভেতরে—স্ত্রী যে মারা গেছে সে কথা একেবারেই ভুলে যায়।

পেছনের ঘর থেকে দোকানওয়ালী তাড়াতাড়ি ছুটে আসে। কাউন্টারের দিকে তাকে হাবার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ে সে আঁৎকে ওঠে। লোকটার চোখ দেখলেই বোঝা যায়, উদ্দেশ্য মোটেই ভালো নয়। এক হাত দিয়ে সে পালক-শোভিত সাটিনের জুতো জোড়া তুলে ধরে, আর হাতটা এগিয়ে দেয় দোকানওয়ালীর দিকে—নখের ফাঁকে ফাঁকে সোনা!

হ্যাঁ, এই হ'লো আপনাদের সোনার মাথাওয়ালা লোকটির কাহিনী।

কাহিনীটা নিছক উদ্ভট মনে হ'লেও, আগাগোড়াই এর সত্যি। এই পৃথিবীতে এমন অনেক হতভাগ্য আছে, মস্তিষ্কের কৃপায়ই যাদের বেঁচে থাকতে হয়, অথচ তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারের জন্যই বিসর্জন দিতে হয় তাদের জীবনের যতো স্বর্ণ-সম্পদ। এটা তাদের নিরন্তর নির্যাতন ভোগের কাহিনী এবং তারপর একদিন যখন তারা জ্বালা যন্ত্রণার দুঃসহ চাপে ভেঙে পড়ে, তখন—?

শেমিয়্যের মঙ্গলদেবতা

শেমিয়্যের ধর্মযাজককে আজ এক মুমূর্ষু রোগীর কাছে পবিত্র ক্রুশটি নিয়ে যেতে হবে।

বসন্তের এমন সুন্দর দিনটিতে চারদিক মেতে উঠেছে নতুন প্রাণের সাড়ায়—নতুন আলোর উৎসবে। আর এমনি সময় কেউ ম'রে যাচ্ছে—ভাবতেও দুঃখ লাগে। তাও আবার ভরা দুপুরে।

দুপুরে খেয়ে উঠেই বুড়োকে ছুটতে হবে সেই কোন দূরে, এটা আরও দুঃখের। অন্যদিন এমনি সময় ধর্মগ্রন্থখানা হাতে নিয়ে গাছের ছায়ায় কখন তিনি ঘুমিয়ে প'ড়তেন—প্রাণখোলা হাওয়ায় ঘুমিয়ে প'ড়তেন নানা ফলে ভরা সুন্দর বাগানের নিরালা শান্তির মাঝে। আর আজ ?

"সবই তোমার ইচ্ছা দয়াময়"—যাজক দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এবারে তিনি একটা ধূসর রংয়ের গাধার পিঠে উঠে বসলেন। সামনেই জিনের উপরে রাখলেন ক্রুশটি। দুই পাহাড়ের মাঝের সংকীর্ণ রাস্তা ধ'রে চ'লেছেন তিনি। ফুলেভরা শেওলা ও পাথর কুচোয় ছেয়ে আছে সারা পথ। সমতল ভূমি পর্যন্ত নেমে এসেছে ঝোপঝাড়ের সারি।

বেচারা গাধাটাও ঠিক যাজকটির মতোই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লছিলো, "সবই তোমার ইচ্ছা দয়াময়," আর সাথে সাথে কান নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছিলো। মাছিগুলো ওকে যেনো পাগল ক'রে তুলেছে।

দুপুর বেলায় মাছিগুলো যা ঝালাপালা ক'রে তোলে,—ঠিক দুষ্ট গ্রহের মতোই। একে ক্রুশটি ব'য়ে নিতে হবে,—বোঝাও কম নয়,

—বিশেষ ক'রে খাওয়া দাওয়ার পরেই ; তার উপরে আবার খাড়া পাহাড়ের চড়াই।

কখনো বা দু-একজন কৃষক পাশ দিয়ে চ'লে যেতে যেতে পবিত্র ক্রুশের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াচ্ছে। ধর্মযাজকও নিজের অজ্ঞাতসারেই তাদের প্রতিনমস্কার জানিয়ে চ'লেছেন। ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে আসছিলো।

ভিলাঁদ্রি পেরিয়ে যেতেই পাহাড়গুলোও যেনো ক্রমশ উঁচু হ'য়ে উঠেছে, খাড়া পথও ক্রমেই সংকীর্ণ হ'য়ে আসছে। আচমকা একটা মালগাড়ির কোচোয়ানের হৈ হৈ শব্দে তাঁর তন্দ্রা ভেঙে যায়। খড় বোঝাই গাড়ি। চাকা ঘোরার সংগে সংগে বারবার একদিকে কাত হ'য়ে পড়ছিলো গাড়িটা, আবার তাল সামলে নিচ্ছিলো।

সে এক সংকট মুহূর্ত। পাহাড়ের গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোলেও দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলা অসম্ভব। আবার সেই বড়ো রাস্তা ঘুরে? না, তা সম্ভব নয়। রোগীটির মরতেও দেরী নেই আর। তাই তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্যই যাজক এই সোজা পথ ধরে চ'লছিলেন। তিনি কোচোয়ানকে তার অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গেঁয়ো চাষা সে কথায় কর্ণপাতও করে না।

"আপনার কথা শুনে আমারও দুঃখ লাগছে মশাই!"—মুখ থেকে পাইপটা না নামিয়েই বলে সে, "কিন্তু পাশের রাস্তা ধ'রে 'আজে' গাঁয়ে ফিরে যাওয়া এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। যা অসহ্য গরম। কিন্তু গাধার পিঠে চ'ড়ে আপনি তো বেশ সহজেই যেতে পারেন।"

"শেমিয়্যের মংগলদেবতার ক্রুশ এটা ; চোখে দেখছিস না হতভাগা? এক মুমূর্ষুর কাছে নিয়ে চ'লেছি—দেখছিস না ধর্মনাশা কোথাকার?"

"আমি তো ভিলাঁদ্রির লোক," কোচোয়ান উত্তর জানায়, "শেমিয়ের

দেবতা, তাতে আমার কি ? হট্ ! হট্ !”—বিধর্মী কোচোয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারে। গাধাটা সবশুদ্ধ পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে প'ড়ে গেলেও তার মাথা ঘামাবার দরকার করেনা।

যাজকও এবারে ধৈর্য হারালেন। “হুঁ, তাই ভেবেছিস ? আচ্ছা দাঁড়া, দেখিয়ে দিচ্ছি তোকে।” সংগে সংগেই নেবে প'ড়ে একটা বন্য লতার উপরে পবিত্র ক্রুশটা ঝুলিয়ে রাখলেন তিনি।

তারপর হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা জানালেন : “শেমিয়োর মংগলদেবতা, চোখ মেলে তুমি তো সবই দেখছো। কিন্তু আমিই বা কী ক'রে এর সুবুদ্ধি জাগাই ? আচ্ছা বেশ ! দেখছি। আমার সহায় এই হাতের এক ঘুষি, আর ন্যায়ের বল। তুমি উপর থেকে নিরপেক্ষভাবে আমাদের যুদ্ধটা একবার দেখো। শিগগিরিই এর একটা সমাধান ক'রে ফেলছি !”

প্রার্থনা শেষ হ'লো। তিনিও দাঁড়িয়ে উঠে জামার দস্তানা গুটোতে লাগলেন, তার সুন্দর কোমল হাত দিয়ে ঘুষি বাগালেন। ধর্মযাজক ঐ হাত দিয়েই কিন্তু কতো লোককে কতো আশীর্বাদ ক'রেছেন ! এদিকে সংগে সংগেই উঁচিয়ে উঠলো কোচোয়ানের বজ্রমুষ্টি।

দুড়ুম্, দড়াম ! এক ঘুষিতেই কোচোয়ানের মুখের পাইপ দাঁতের মধ্যে ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেলো, আর দ্বিতীয় ঘুষিতে সে গড়িয়ে প'ড়লো গভীর একটা পরিখার মধ্যে—ক্ষতবিক্ষত দেহে আধ-মরার মতো।

তারপর যাজকটি গাড়িটাকে টেনে তুলে ঘোড়াটার সংগে জুতে রাখলেন—পাহাড়ের পাদদেশে একটা মালবেরি গাছের ছায়াতে। এবারে জোর কদমে গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটলেন তিনি। গিয়ে দেখেন, মশারির নীচে দিব্যি ব'সে আছে তার রোগী। ইন্দ্রজালের

প্রভাবেই যেনো জ্বর তার থেমে গেছে। পুনর্জীবন পাওয়ার আনন্দে সে একটা মদের বোতলের ছিপি খুলবার চেষ্টা ক'রছে। এই আরোগ্য ব্যাপারে আমাদের যাজকটি কতটুকু সাহায্য ক'রলেন, সে হিসেবের ভার আপনাদের উপরেই।

তবে, সেই থেকেই শেমিয়োর মংগলদেবতা ভুরেন্ শহরে খুব বিখ্যাত হ'য়ে পড়েন। এবং কোনো বিবাদ বাঁধলেই সমস্ত নাগারকেরা তার উদ্দেশে নিবেদন করে: "শেমিয়োর মংগলদেবতা, নিরপেক্ষভাবে বিচার করো।"

তিনিই যুদ্ধবিগ্রহের দেবতা। কাউকেই অনুগ্রহ করেন না তিনি। তবে তার অনুগ্রহেই শক্তিমানেরা নিজ নিজ শক্তি ও প্রতিপত্তি বলে জয়লাভ ক'রে থাকে। যখন সুদিন আসবে—বুঝতেই পারছেন কোন দিনের কথা ব'লছি—সেই বিজয় দিনে কোনো বীর নেতার উদ্দেশে প্রার্থনা বা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রবো না আমরা,—উৎসবও ক'রবো না। না, আজ থেকে আর প্রভু সাবাত্‌কে প্রার্থনা জানাবো না, —জানাবো শেমিয়োর মঙ্গলদেবতাকে। তার কাছে এই নিবেদন ক'রবো:

প্রার্থনা

"হে শেমিয়োর মংগলদেবতা! ফরাসীরা তোমার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে। তুমি জানো, বিজাতীয়েরা আমাদের উপর কী অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে; আজ তাহার প্রতিহিংসা লইবার দিন। ইহার জন্য আমরা কাহারও সাহায্য চাই না। আজ আমাদের পক্ষে আছে জোরালো কামান,—আছে শৌর্য বীর্য, আছে ন্যায্য অধিকারের দাবী। অতএব তুমি নিশ্চিন্তে নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় আমাদের যুদ্ধ দর্শন কর। ঐ সব হতভাগ্যদের সমুচিত শিক্ষা হউক!"

আলে'র মেয়ে

গ্রামের পথে যেতে যেতে পাশেই পড়ে একটা বাড়ী, মস্তো বড়ো আঙিনার প্রান্তে নেটল গাছে ঘেরা। প্রভাঁসীয় কৃষকের উপযুক্ত বাসাঘরই বটে। লাল টালির ছাত, সামনের দিকটায় এলোমেলো-ভাবে বসানো কয়েকটা জানলা। ঘরের উপরে হাওয়ায় নড়ছে একটা 'ওয়েদারকক'। বাড়ীর একপাশে একটা খড়ের গাদা।

এই বাড়ীটা এমনভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে কেন? ঐ বন্ধ দরজা দেখে কাঁপ্‌ছে কেন আমার বুক? তা' জানিনা, তবে ঐ বাড়ীটা দেখেই গা আমার শিউরে উঠেছে। এর চারদিকেই কেমন একটা ভয়ানক স্তব্ধতা। কেউ পাশ দিয়ে চলে গেলেও ডেকে ওঠেনা কুকুর, মোরগ দৌড়ে চলে যায় নিঃশব্দে। ভিতরেও কোনো সাড়া শব্দ নেই—কিছুই নেই—এমন কি গরুর গলার ঘণ্টার শব্দও শোনা যায় না। জানলার কাছে শাদা মশারিটা এবং ছাতের উপরে উড্ডীন ধুঁয়োরেখাটি চোখে না পড়লে যে কেউই এটাকে পোড়ো বাড়ী বলে মনে করবে।

কাল ঠিক দুপুর বেলায় গাঁ থেকে ফিরছিলাম। রোদ এড়াবার জন্য নেটল গাছের ছায়ায় ছায়ায় এই গোলাবাড়ীটার গা ঘেঁষে চলছিলাম। বাড়ীটার সামনে রাস্তার উপরে মজুরেরা নীরবে একটা গাড়ীতে খড় বোঝাই কচ্ছিলো। গোলাবাড়ীর ফটক ছিল খোলা। যেতে যেতে ভিতরে একবার চোখ ফেলে দেখলাম: আঙিনার প্রান্তে বড়ো একটা পাথরের টেবিলের উপর কনুইতে ভর ক'রে মাথাটা হাত দিয়ে

ধ'রে ব'সে আছে দীর্ঘাংগ এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, তার গায়ে খাটো একটা ফতুয়া, ট্রাউজারটা ছেঁড়া। থমকে দাঁড়ালাম আমি। একজন লোক তখন নীচু গলায় আমাকে বল্‌লো—"চুপ, চুপ, ঐ যে বুড়ো কর্তা। ছেলের সেই দুর্ঘটনা থেকেই বুড়ো অমনটি হ'য়ে গেছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই কালো পোশাক পরা একটি স্ত্রীলোক ও ছোটো একটি ছেলে আমাদের কাছ দিয়ে চ'লে যাচ্ছিলো। স্ত্রীলোকটির হাতে মস্তো বড়ো একখানা প্রার্থনা পুস্তক। গোলাবাড়ীর ভিতরেই ঢুকলো তারা।

তখন সেই লোকটি বললো,—"বাড়ীর কর্ত্রী ও ছোটো ছেলে কাদেত্‌ গীর্জা থেকে এই ফিরলো। বড়ো ছেলে আত্মহত্যা করার পর থেকেই রোজ তা'রা গির্জায় যায়। এখানে সবই আজ শ্মশানের মতো! কর্তা এখনো মরা ছেলের পোশাক পরে থাকে, কিছুতেই কেউ তা' খুল্‌তে পারেনি। ট্‌, ট্‌! চলিয়ে।"

চলার মুখে নড়ে উঠলো গাড়ীটা। আমার কিন্তু সমস্ত ঘটনাটাই জানতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। তাই কোচোয়ানের অনুমতি নিয়ে তার পাশে এসে বসলাম। এবং সেই খড়ের গাদায় বসেই শুন্‌তে পেলাম এক মর্মান্তিক কাহিনী।

নাম তার জেন। বিশ বছর বয়সের চমৎকার এক কৃষক ছিলো সে। সুন্দর, সুগঠিত ছিলো দেহ, সরল ছিলো মুখখানি। সব মেয়েরাই অপলক চোখে চেয়ে থাকতো তার দিকে। কিন্তু জেনের সারা বুক জুড়ে ছিলো একটি মাত্র মেয়ে,—আর্লে'র ছোট্ট একটি মেয়ে। ভেলভেটের পোশাক তার গায়ে, কেমন সুন্দর তার সাজসজ্জা। তাকে দেখেছে সে আর্লে। কিষাণ বাড়ীর সবাই কিন্তু প্রথমে এই মেলামেশাটা ভালো চোখে দেখেনি। মেয়েটির চরিত্র নাকি একটু

আপত্তিজনক। আর, তার বাবা-মাও এ গাঁয়ের নয়। তা' যাই হোক না কেন, আর্লের সেই মেয়েটিকে জেনের চাই-ই। সে একদিন বললো,—

"ওকে তারা আমার হাতে না দিলে আত্মহত্যা করবো আমি।"

শেষ পর্যন্ত তাদের রাজীই হ'তে হলো। ঠিক হলো, সামনের ফসল ওঠার পরেই তাদের বিয়ে হবে।

আর, তারপর? এক রোববার ভোরে এই কৃষক পরিবারের সবাই অঙিনায় বসে খাওয়া-দাওয়া কচ্ছিলো। ঠিক বিয়ের ভোজের মতোই সেই আয়োজন। পাত্রীই শুধু অনুপস্থিত। তবু খেতে খেতে সবাই পাত্রীর মংগল কামনা কচ্ছিলো বারবার। তখন একটি লোক এসে উপস্থিত হলো এবং কম্পিত কণ্ঠে গৃহকর্তা স্তিফেনের কাছে এসে কিছু বলার জন্য আবেদন করলো,—শুধু একাকী স্তিফেনের কাছেই! স্তিফেন উঠে এলো রাস্তায়।

"দেখুন",—লোকটি বলতে লাগলো, "আপনার ছেলেকে বিয়ে দিতে যাচ্ছেন একটা বদ মেয়ের সংগে—আমারই অনুগৃহীতা আছে সে এই দু'বছর ধরে। আমার কথার প্রমাণও দেখাতে পারি। এই যে চিঠিপত্র। মেয়ের মা-বাবা জানে সবি এবং মেয়েকে তারা আমার সাথেই বিয়ে দেবে ব'লে কথা দিয়েছে, কিন্তু এখন আপনার ছেলে তাকে চায়, তাই মেয়েটির সংগে এবং তার বাবা-মার সংগেও আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। তবু একটা কথা আমার মনে হয়, এতো সব বিশ্রী ব্যাপারের পরে ঐ মেয়ের আমার ছাড়া অন্য কারুর স্ত্রী হওয়া উচিত নয়।"

"বেশ, তাই হবে।"—চিঠিপত্র দেখে স্তিফেন বলে,—"আসুন, ভেতরে আসুন, এক গ্লাস সরবত খেয়ে যান।" ভদ্রলোক ধন্যবাদ

জানিয়ে বললো,—"আমার কাছে খাবার চেয়ে বরং মনের অশান্তিই এখন বড়ো।" এই বলেই চলে গেলো সে। স্তিফেন সহজভাবেই ফিরে এসে টেবিলে বসলো আবার এবং সানন্দেই শেষ হলো খাওয়া-দাওয়া।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা স্তিফেন ও তার ছেলে একত্রে মাঠে গেলো। অনেকক্ষণ তারা মাঠে রইলো। যখন ফিরে এলো, জেনের মা তখন দোরে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতীক্ষা কচ্ছিলো। ছেলের কাছে স্ত্রীকে নিয়ে এসে স্তিফেন বললো, "ছেলেকে একটু আদর করো, বড়ো হতভাগ্য এ।"

জেন আর্লের মেয়েটির কথা আর বলে না। অবিশ্যি এখনো সে তাকে ভালবাসে। অন্য এক পুরুষের বাহুর মধ্যে তারি প্রণয়িনীকে দেখা অবধি তাকে সে আরো বেশী ভালবাসে। তবে মুখ ফুটে কিছু বলতে মর্যাদায় বাধে। ফলে বুক তার দিন দিন ক্ষয়ে যেতে লাগল। হায়রে হতভাগ্য ছেলে! কখনো সে সারাদিনই কাটিয়ে দেয় ঘরের কোণটিতে বসে। কোনোদিন ক্ষিপ্তের মতো মাটি চষ্‌তে থাকে,—দশজন মজুরের কাজ করে সে একাই। সন্ধ্যেবেলা আর্লের পথ ধ'রে সে চলতে থাকে,—তার সামনে ঝল্‌সে ওঠে অস্ত-আলোয় রঙীন আর্ল শহরের ছবি! সংগে সংগেই সে ফিরে আসে, সামনে আর এগোয় না।

ছেলেটিকে এমন নিঃসংগ ও মনমরা দেখে বাড়ীর সবাই কি যে করবে ভেবে পায় না। ভয়ানক কোনো বিপদের আশংকা করে সবাই। একদিন খেতে বসে মা ছেলের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে বলে, "শোনো জেন, সব কিছু শুনেও যদি তুমি তাকে চাও তো এনে দেব তাকেই।"

বাবা লজ্জায় অপমানে মুখ কালো ক'রে মাথা নীচু ক'রে থাকে। জেন মাথা নেড়ে 'না' জানিয়ে চলে আসে বাইরে।

এবং সেদিন থেকেই সে তার জীবন ধারা বদলে ফেলে। বাবা-মাকে সব সময় নিশ্চিন্ত রাখার জন্য হাসিখুসী ভাব দেখায় সে। বলনাচের আসরে, রেস্তোরাঁয়, থিয়েটারে আবার দেখা যায় তাকে। কোনো জায়গায় আনন্দ-উৎসব হ'লে সেই হয় দলের নেতা।

বাবা বললেন একদিন, "আর ভাবনা নেই।" মা'র দুশ্চিন্তা কিন্তু যায় না, ছেলেকে সে চোখে চোখে রাখে। জেন ঘুমোয় ছোটো ভাই কাদেতের সংগে, গুটিপোকা পোষার ঘরটার পাশেই। এর পরেই দুঃখিনী মার শোবার ঘর। রাতের বেলা গুটিপোকা দেখাশোনা দরকার হতে পারে, তাই থাকে সে পাশের ঘরে।

এর পরে এলো কৃষির মঙ্গল-দেবতা সাধু ইলয়ের উৎসব। বাড়ীতে আনন্দের মহড়া। সবার জন্যই খোলা রয়েছে দোর, গ্লাসে গ্লাসে সুরা। তারপর, আতসবাজি পোড়ানোর কী ঘটা। নেটল গাছগুলি ঝলমল করছে রঙীন আলোয়। "সাধু ইলয় কি জয়!" হাঁপাতে হাঁপাতে আধমরা না হওয়া পর্যন্ত সে কী নাচ! কাদেত তো তার নতুন জামাটাই পুড়িয়ে ফেললো। জেনকেও খুব খুসী দেখাচ্ছিলো। সে এক রকম আব্দার করেই তার মাকে নিয়ে আসরে যোগ দিলো। হতভাগিনী মা তো আনন্দের আবেগে কেঁদেই ফেলে!

রাতে শুতে গেছে সবাই। সবারি এখন ঘুমানো দরকার। জেন কিন্তু ঘুমোয় নি। কাদেত্ পরে বলেছে, গোটা রাতই জেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কাটিয়েছে। তার প্রাণে লেগেছে মরণ আঘাত।

ভোর বেলায় মা শুনতে পেলো, কে যেনো ছুটে চলে যাচ্ছে তার ঘরের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ একটা আশংকা জেগে ওঠে,—"জেন, জেন, তুমি ?"

জেন উত্তর দেয় না,—ইতিমধ্যেই সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলেছে।

মাও ছুটলো তাড়াতাড়ি। "জেন, জেন, যাচ্ছো কোথায়?"

জেন তখন চিল কুঠিতে উঠে এসেছে,—তার মাও পিছু পিছু— "জেন, লক্ষ্মী ছেলে, জেন!"

জেন দোর বন্ধ ক'রে খিল এঁটে দিলো। "জেন, লক্ষ্মী জেনেত্, কি করতে যাচ্ছো তুমি?"

শীর্ণ কম্পিত হাতে সে খিলটা হাতড়াতে থাকে। ওদিকে খুলে গেলো একটা জানালা এবং একটি দেহ ধপ ক'রে পড়লো নীচে আঙিনার সিঁড়ির উপর। সংগে সংগেই সব শেষ।

বেচারা জেন বলছিলো, "আমি যাকে বুক ভ'রে ভালবাসি তার কাছেই যাবো আমি, আমি যাবো। ওঃ, কী মর্মান্তিক দুঃখই না মানুষকে সহ্য করতে হয়,—অথচ ঘৃণাও ভালবাসাকে ধ্বংস করতে পারে না!"

সেদিন ভোরে গাঁয়ের সবাই বিস্মিত হ'য়ে ভাবছিলো, স্তিফেনের বাড়ীর দিকে কে এমন গলা ছেড়ে কাঁদছে।

কাঁদছে জেনের মা। আঙিনায় উন্মাদিনীর মত নগ্নদেহে তার মৃত ছেলের রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড দুই বাহু দিয়ে সজোরে বুকে চেপে কাঁদছে সে।

মাষ্টার কর্ণেই-র মিল

বংশীবাদক ফাঁসে মামে প্রায়ই আমার কাছে এসে বসে। গল্পসল্পে ও সুরার প্রীতিকর আবহাওয়ায় জ'মে ওঠে মুখর সন্ধ্যাগুলি। বুড়ো সেদিন আমাকে একটা গল্প ব'ললো—ঠিক যেন ছোট্ট একটি নাটক। বছর বিশেক আগে আমার মিল স্বচক্ষে দেখেছে সেই নাটকটি। বুড়োর গল্প শুনে ভারী ভালো লেগেছিলো আমার। যেমনটি তার কাছ থেকে শুনেছি, তোমাদেরও ঠিক তেমনি বলতে চেষ্টা করবো।

আমার প্রিয় পাঠক, ভাবো একবার: সুগন্ধি, ফেনিল মদিরার সামনে বসে আছো তুমি; আর এক বুড়ো গল্প বলে যাচ্ছে কেমন সুন্দর!

আমাদের গ্রাম আজ মরণদশায় এসে পৌছেচে, কেউ এর নামও জানে না। চিরদিন কিন্তু এমন ছিলো না। অনেক দিন আগে এখানে মস্তো বড়ো একটা ব্যবসা চলতো। দশ পনের মাইলের মধ্যে যতো লোক আছে, তারা সবাই আমাদের কারখানায় শস্য ভাঙাতে দিয়ে যেতো। যেদিকে তাকাও, অসংখ্য উণ্ডইমিলে ঢেকে গেছে গ্রামের যতো সব পাহাড়, দীর্ঘ পাইনবন ছাড়িয়ে উঠেছে মিলের পালগুলি, ঘুরছে উত্তুরে হাওয়ায়। ছোট ছোট গাধাগুলি দল বেঁধে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছে, কখনো বা রাস্তা ধ'রে এগিয়ে আসছে। সবার পিঠেই শস্যের বস্তা। গোটা হপ্তা ধ'রেই কর্মব্যস্ত পাহাড়ের উপরে চলতো কারখানার মজুরদের হৈ হল্লা। কী চমৎকার সে দৃশ্য। তারপর রোববারে আমরা সবাই মিলে যেতাম মিলমালিকদের

বাড়ি। তারা আমাদের অভ্যর্থনা করতো মুস্কট সুরা দিয়ে। মালিকদের স্ত্রীরা দেখতে ঠিক যেন রাণীর মতো, গলায় তাদের সুন্দর সোনালি ফিতে ; সোনার ক্রুশ দিয়ে কাপড় আঁটা। বাঁশী সংগে ক'রেই যেতাম তাদের কাছে। নাচগানে কেটে যেতো সন্ধ্যে অবধি। এই উইণ্ড-মিলগুলিই ছিলো আমাদের গ্রামের গর্বের বস্তু, আমাদের একমাত্র সম্পদ।

দুর্ভাগ্যবশত, হঠাৎ প্যারীর কয়েকজন ফরাসী স্থির করলো, তারাস্কঁ রাস্তার ধারে তারা একটা ময়দার ষ্টীমমিল বসাবে। তারপর একদিন ঝলমল ক'রে উঠলো একটা মিল বাড়ী। গ্রামের লোকগুলিও ঝুঁকে পড়লো ষ্টীম-মিলের দিকে। তারা এখন আর আমাদের পুরোনো মিলগুলোতে শস্যাদি পাঠায় না। ফলে মিলগুলো অকেজো হ'য়ে পড়লো। কিছুদিন সেগুলি ষ্টীমমিলের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো। কিন্তু ষ্টীমের সংগে পেরে ওঠে কার সাধ্য! ঘটনাচক্রে এক এক ক'রে সব উইণ্ডমিলগুলোই বন্ধ হ'য়ে গেলো। রাস্তাঘাটে আর দেখা যায় না সেই গাধার সারি। মালিকদের স্ত্রীরা অভাবে প'ড়ে তাদের সোণার ক্রুশ বিক্রী ক'রে ফেলেছে। কোথায় সেই নাচগান আর মুস্কট সুরা? কিন্তু মিলের পালগুলো এখনো ঘুরছে ঠিক আগের মতোই। কোনো ঝড়ঝাপটাই তাদের কিছু করতে পারেনি। তারপরে একদিন উপর থেকে আদেশ এলো, স্থানীয় বস্তিগুলি সব ভেঙে ফেলতে হবে। সেই শ্মশানভূমিতে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো আঙুর আর জলপাই গাছের সারি।

কিন্তু এতো সব হেস্তনেস্তর মাঝেও ছোট একটা মিল সগর্বে মাথা উঁচু করে রইলো পাহাড়ের বুকে। ষ্টীম এসে তার কিছুই করতে পারে নি। এটা হলো মাষ্টার করনেই-র মিল এবং সেই জায়গাটিতেই আজ সন্ধ্যায় আমরা সবাই জ'মে বসেছি।

মাষ্টার কর্‌নেই মিলের মালিক। ময়দা আর গমের মাঝেই কেটেছে তারা সারা জীবন—দীর্ঘ ষাট বছর। বুড়ো দিনরাত প'ড়ে থাকতো তার এই মিল নিয়ে। ষ্টীমমিল স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই সে পাগলের মতো কাজে লেগে গেলো। সাত আট দিন ধরে সে কেবল গ্রামের এদিক থেকে ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগলো; সবাইকে এক সংগে জড়ো ক'রে গলা ফাটিয়ে বলতে লাগলো: "তোমরা শোনো সবাই, ওরা ঐ ষ্টীমমিলের ময়দা দিয়ে আমাদের সমস্ত অঞ্চলটা বিষাক্ত করে ফেলতে চায়!"

"কেউ ওখানে যেওনা", বুড়ো বললো, "ঐ পাজি ব্যাটারা বাষ্পের জোরে রুটি তৈরী করে,—বাষ্প মানেই শয়তান। কিন্তু আমার মিল চলে উত্তুরে বাতাসে—সে বাতাস বিধাতার সঞ্জীবনী নিশ্বাস।" তারপর উইণ্ডমিলকে প্রশংসা করে কতো কথাই না সে বললো! কিন্তু দুঃখের বিষয় তার কথায় কেউই কর্ণপাত করলো না।

রাগে দুঃখে বুড়ো মিলের দরজা বন্ধ ক'রে নিজে তার ভেতরে বন্দী হ'য়ে রইলো—ঠিক একটি বন্য জন্তুর মতোই। এমন কি কর্‌ণেই তার নাত্‌নি ভিভেৎকেও সংগে নিলো না। ভিভেতের বয়স বছর পনের, তার বাবা মা মারা যাওয়ার পরে ঠাকুর্দা ছাড়া এজগতে আর তার কেউ নেই। বেচারী ভিভেত্‌ তখন বাধ্য হ'য়ে জীবিকা অর্জনের জন্যে বেরোলো! নানা কারখানায় গিয়ে জোর গলায় বলতো সে: চাই লোক চাই, রেশমের গুটি কুড়োবার জন্যে লোক চাই, জলপাই বা শস্যের কাজে লোক চাই। কিন্তু তবুও ঠাকুর্দা নাতনীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। তাকে দেখবার জন্যে বুড়ো প্রায়ই রোদে পুড়ে চার পাঁচ মাইল হেঁটে যায়। কারখানা ছুটি হ'লে বেরিয়ে আসে ভিভেত্‌। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একদৃষ্টিতে বুড়ো তার নাতনীর

দিকে চেয়ে থাকে, আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে নীরবে। ভিভেত্‌কে সে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসে।

গ্রামের লোকেরা ভাবতো, করণেই টাকার লোভে নাতনীকে সংগে রাখে না। কারখানায় কারখানায় ঘুরে বেড়ায় ভিভেত্‌, মজুরদের কুৎসিত মন্তব্যও শুনতে হয় তাকে,—আর তা ছাড়া অল্প বয়সী মেয়েদের আরো কত রকম অসুবিধে আছে। ভিভেতকে এরকম ভাবে ছেড়ে দেওয়া করণেইর মোটেই উচিৎ হয়নি। তারপর, করণেইর মতো আত্মসম্মান-সচেতন, নামজাদা লোক যে একটা রাস্তার ভিখারীর মতো কদর্য পোশাকে বাইরে বেরোয়, এটাও তারা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেনি। পায়ে জুতো নেই, টুপীটার তো সর্বাংগই ছেঁদা; গায়ের কোটটা কদিন টিকবে ভগবানই জানেন। সত্যি বলতে কি রোববারে তাকে এই অবস্থায় দেখে আমরা সবাই অত্যন্ত লজ্জিতই হ'লাম। কর্‌ণেই-ও তা নিজে বুঝতে পেরে গির্জার ভেতরে ঢুকলো না। গির্জার পেছনে এবং পুকুরের ধারে ব'সে গরীব দুঃখীদের সংগে গল্প ক'রেই কাটিয়ে দিলো সমস্ত দিনটা।

মাষ্টার কর্‌নেই-র একটা ব্যাপার আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। অনেকদিন হলো, গ্রামের কেউই তাকে এককণা শস্য দিচ্ছে না। অথচ মিলের পালটা তো ঘুরছে ঠিক আগের মতোই। সন্ধ্যেবেলায় গ্রামের লোকদের সংগে রাস্তায় এই বুড়োর দেখা। গাড়ি বোঝাই ময়দার বস্তা নিয়ে ওরা ষ্টীমমিলের দিকে যাচ্ছিলো।

"কেমন আছেন মাষ্টার কর্‌ণেই?" কৃষকরা চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে, "ব্যবসা এখনো পুরোদমেই চলছে?"

"হ্যাঁ বাবা, ভালোই চলছে", বুড়ো হাসিমুখে উত্তর জানায়, "ভগবানের কৃপায় আমাদের এখন আর কাজের অভাব হয় না।"

কেউ হয়তো প্রশ্ন করে বুড়োকে, "তুমি তো বলেছিলে শয়তানের কারখানা, তাহ'লে এখানে এতো কাজ আসে কেন?" বুড়োও ওষ্ঠের উপর আঙুল রেখে গম্ভীরভাবে বলে, "চুপ, মাল রপ্তানী করতে হবে, জোর কাজে ব্যস্ত এখন।" তার কাছ থেকে আর কোনো খবরই পাওয়ার যো নেই।

কারুর সাধ্য নেই, গলা বাড়িয়ে তার মিলের ভেতরটা একবার দেখে আসে। এমন কি ভিভেত্ও আজ পর্যন্ত ওর ভেতরে ঢোকেনি।

পথিকেরা করণেই-র মিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতো: মিলের দরজা সব সময়েই বন্ধ, মস্তো পাল দুটো ঘুরছে মাতালের মতো, বুড়ো গাধাটা মিলের সামনে প্লাটফর্মের উপরে বসে লতাপাতা চিবোচ্ছে; শুকানা চেহারার একটা বেড়াল জানলার উপরে ব'সে রোদ পোয়াচ্ছে, সন্দেহের বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদেরই দিকে।

এর সব কিছুই রহস্যময়। লোকেরা প্রায়ই এই ব্যাপারটা নিয়ে কাণাঘুষো করে। ব্যক্তিগত অভিমত পেশ করতেও ছাড়ে না কেউ। তবে করণেই-র সম্বন্ধে সাধারণের মন্তব্য হলো: মিলের ভেতরে শস্যের বস্তা থাক বা না থাক, টাকার বস্তা আছে অনেক।

যাহোক, কিছুদিন পরে সব কিছুই প্রকাশ পেলো। কি ভাবে বলছি।

একদিন আমি একটা নাচের সংগে বাঁশী বাজাচ্ছি; এমন সময় লক্ষ্য করলাম, আমার বড়ো ছেলে এবং ভিভেত্ দুজনেই দুজনকে ভালোবেসেছে। মনে মনে অখুশি হইনি। কারণ শত হ'লেও শেষ অবধি আমরা করণেইকে সম্মান করেই আসছি। তা ছাড়া ফুটফুটে মেয়ে ভিভেত্ আমার ঘরে এসে হেসে খেলে বেড়াবে—এ তো আমারও আনন্দের কথা। কিন্তু এই প্রেমিক দুটি মেলামেশার

অবাধ সুযোগ পেতো, তাই কোনো দুর্ঘটনা হবার আশংকায় শিগগিরি এই প্রসংগের শেষ সমাধা ক'রে ফেলবো ঠিক করলাম। ঠাকুর্দার কাছে দু'একটা কথা বলবো ব'লে তক্ষুণি তার মিলে চ'লে গেলাম। যাদুকরের মতোই রহস্যময় এই বুড়ো। কিভাবে আমাকে সে অভ্যর্থনা করলো তা যদি কেউ দেখতো একবার! তাকে দিয়ে কিছুতেই মিলের দোর খোলাতে পারলাম না। গা-তালার ফাঁক দিয়েই কোনো রকমে আমার বক্তব্য বুঝিয়ে বললাম তাকে। এতক্ষণ ধ'রে ঐ পাজি বেড়ালটা যে আমার মাথার উপরে বসেই নাক ডেকে চলেছে তা লক্ষ্যও করিনি।

আমার কথা শেষ না হতেই বুড়ো অভদ্রের মতো চেঁচিয়ে উঠলো। "যাও, তুমি তোমার বাঁশী বাজাও গে। ছেলে বিয়ে দেবার এতো তাড়া থাকে তো ঐ ষ্টীমমিলের কোনো মেয়ে দেখো। যাও মরো গে।" বুঝতেই পারছো, বুড়োর এই রুক্ষ কথা শোনামাত্রই আমার রক্ত মাথায় ওঠার অবস্থা। যা হোক, নিজেকে কোনো রকমে সামালে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে ছেলেমেয়ে দুটির কাছে সব খুলে বললাম। আমার এই ব্যর্থতার সংবাদ শুনে তারা তো প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করে না। আমার অনুমতি চাইলো: একসংগে মিলে গিয়ে তারা বুড়োর সংগে কথা ব'লে আসবে। তাদের ফিরিয়ে দেবার মতো সাহসও ছিল না আমার। অনুমতি দিলাম। প্রেমিক দুটিও বেরিয়ে পড়লো তক্ষুণি।

তারা কারখানায় পৌঁছুবার একটু আগেই ঠাকুর্দা বাইরে বেরিয়েছে। দোরে তালাচাবি লাগানো। কিন্তু বুড়ো যাবার সময় ভুলে মইটা বাইরেই ফেলে গেছে। হঠাৎ ছেলেমেয়ে দুটির মনে হ'লো,—মই বেয়ে জানলা দিয়ে একবার দেখেই আসি না এই বিখ্যাত মিলটার ভেতরে এমন কী রয়েছে।

কী আশ্চর্য, কারখানার বড় ঘরটা একদম ফাঁকা। একটা বস্তা, বা এককণা শস্য—কিচ্ছু নেই। দেয়ালে বা মাকড়সার জালে কোথাও ময়দার চিহ্নমাত্র নেই। গমের মিঠে গন্ধে সমস্ত মিলের বাতাসই কেমন ভ'রে ওঠে, কিন্তু বুড়োর মিলে তো তার নামগন্ধও নেই। চেয়ারের একটা ভাঙা হাতল শুধু ধূলোয় ধূলোয় শাদা হ'য়ে আছে; আর তারি পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে সেই দুষ্টু বেড়ালটা ঘুমুচ্ছে একটানা।

নিচের ঘরগুলিতেও সেই একই দারিদ্র্যের ছবি; সর্বত্রই যত্নের অভাব। একটা নোংরা বিছানা, কয়েকটা ছেঁড়া কাপড়, সিঁড়ির উপরে রয়েছে এক ফালি রুটি, আর এক কোণে তিনটে কি চারটে ফেটে-যাওয়া বস্তা,—রাবিশ ও সিমেণ্টগুলি বেরিয়ে প'ড়েছে।

এইটেই হ'লো মাষ্টার করণেই-র গোপন কাহিনী। বুড়ো রাতের বেলায় এই সিমেণ্টের বস্তাগুলিই রাস্তা থেকে জাঁকজমক ক'রে তার কারখানায় নিয়ে আসে। লোককে সে জানতে চায় উইণ্ডমিলের সম্মান এখনো বজায় আছে, এখনো করণেই ময়দা তৈরী ক'রে চলেছে সমানে। হায় রে, সেই উইণ্ডমিল, বেচারা করণেই! আজ অনেক দিন হলো ষ্টীমমিলের মালিকেরা করণেই-র শেষ ক্রেতাটি পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কারখানার পালগুলি অবিশ্যি ঘুরছে এখনো; কিন্তু মিলে কোনো কাজই হ'চ্ছে না।

ছেলেমেয়ে দুটি ছলছল চোখে আমার কাছে ফিরে এসে সব ব'ললো। তাদের কথা শুনে আমার বুক ফেটে কান্না আসছিলো। একটু সময়ও নষ্ট না ক'রে পাড়ার সবার কাছে ছুটে গেলাম। দু'কথায় তাদের সব বুঝিয়ে বললাম এবং তক্ষুণি প্রতিজ্ঞা ক'রলাম সবাই—যার ঘরে যতোটুকু শস্য আছে সব আমরা করণেই-র মিলে গিয়ে দিয়ে আসবো। যেমনি বলা তেমনি কাজ। সারা গাঁটাই যাত্রা ক'রলো এই শুভ উদ্দেশ্যে।

গাধার পিঠে শস্য চাপিয়ে দিয়ে আমরা সবাই এক সংগে একটা পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌছুলাম। সে এক বিরাট শোভাযাত্রা বটে!

করণেই-র কারখানার দরজাগুলো হা ক'রে আছে। সামনেই করণেই একটা সিমেন্টের বস্তার উপরে ব'সে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মিলে ফিরে এসে বুড়ো দেখতে পায়—তার অনুপস্থিতির সুযোগে কে যেনো ভেতরে ঢুকে কারখানা চলবার মর্মান্তিক রহস্য আবিষ্কার ক'রে গেছে।

"হায় হায়", বুড়ো বলছিলো, "এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র কাম্য। আমার কারখানার এতদিনকার সম্মান আজ নষ্ট হলো।"

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, যেনো এখনি তার বুক ভেঙে যাবে। কতো আদরের ডাকে সম্বোধন ক'রে ক'রে সে তার মিলের সংগে কথা ব'লছিলো।—মিলটা যেনো সত্যিকারের এক জীবন্ত মানুষ!

ঠিক তক্ষুণি গাধাগুলি নিয়ে আমরা সবাই প্লাটফর্মে হাজির হ'য়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম,—মিলমালিকদের সুখের দিনে যেমনটি করতাম আমরা। "জয় জয়, মিল কি জয়! মাষ্টার করণেই কি জয়!"

দেখতে দেখতে দোরের সামনে বস্তার পাহাড় জ'মে উঠলো। সোনালি শস্যে ছেয়ে গেলো চারদিকের মাটি। মাষ্টার করণেই বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখছে সব। আঁজল ভ'রে শস্য নিয়ে বুড়ো ব'লতে লাগলো, হাসিকান্না মেশানো সেই স্বর।

"এ যে শস্য! সত্যিকারের মাঠের শস্য! তোমরা আমাকে চোখ জুড়িয়ে একবার দেখতে দাও।" তারপর আমাদের দিকে ফিরে ব'ললো সে, "জানতাম, তোমরা আমার কাছেই আবার ফিরে আসবে। ষ্টীমমিলের মালিকরা সব হ'লো চোর, জোচ্চোরের দল!"

আমরা প্রস্তাব ক'রলাম, জাঁকজমক ক'রে বুড়োকে গ্রামে নিয়ে যাবো।

"না, না", বুড়ো ব'ললো, "প্রথমে আমি আমার মিলের মুখে কিছু খাবার তুলে দেবো। একবার ভেবে দেখো, আজ কতদিন একটি দানাও ওঁর পেটে পড়েনি।"

বুড়োর দশা দেখে আমাদের সবারই কান্না পেলো। সে কেবল এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিলো, বস্তাগুলি খুলছিলো—ঠিক পাগলের মতোই! সেই সিমেণ্টগুলি বের করতে গিয়ে করণেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। এদিকে তখন তার কারখানায় শস্য ভাঙা হ'চ্ছে, গমের শাদা ধূলোর প্রলেপ পড়ছে ছাতের কড়ি বরগায়।

আমাদের গাঁয়ের লোকদের প্রতি অবিচার করা উচিত নয়। সেই দিন থেকে আর করণেই-র মিল কাজ অভাবে বন্ধ হ'য়ে রয়নি কখনো। তারপর একদিন সকালবেলা মাষ্টার করণেই মারা গেলো। মিলের পালগুলিও বন্ধ হ'য়ে গেলো—এবারে চিরদিনের জন্যেই। করণেই-র মৃত্যুর পর কেউ আর তার পদাংক অনুসরণ করলো না! এর বেশী কী বা আশা করতে পারি আমরা? এই পৃথিবীতে সব কিছুরই সমাপ্তি আছে এবং আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, আজ উইণ্ডমিলের দিন আর নেই, রণের বুকেও যেমন আর প্রাচীন দিনের বজরা নেই, সেই পার্লিয়ামেণ্ট নেই, নেই আর পুরোনো দিনের জমকালো পোশাক।

অঁতাস

লুসিআঁ রেবার ও অঁতাস-এর বিয়ে হলো এই আট দিন। অঁতাসের মা মাদাম ভ্যাভে ত্রিশ বছর ধরে একটা পুতুলের দোকান চালিয়ে আসছে।

উদ্ধত প্রকৃতির স্ত্রীলোক সে, খুব চটপটে ও চোখা, টানে-পরেণে সমান। তার বসতি-অঞ্চলের এক কর্মকারের একমাত্র ছেলের সংগে তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব এলে সে গররাজি হ'তে পারে নি,—তাই এখন এই তরুণ যুগলের উপরে বিশেষ কড়া নজর রাখছে। বিয়ের চুক্তি-মতে সে পুতুলের দোকানটা যৌতুকস্বরূপ মেয়েকে সমর্পণ ক'রে থাকলেও, আসলে দোকান দেখাশোনা করার ফিকিরে সে নিজেই হ'লো এর হর্তাকর্তা।

আগষ্ট মাস, অসহ্য গরম,—কেনাবেচা মন্দা। মাদাম ভ্যাভে তাই আরো বেশী খিটখিটে। লুসিআঁকে কখনো সে অঁতাসকে নিয়ে মশগুল হ'তে দেয় না। একদিন ভোরে তারা দুজনে দোকানে বসেই চুমো খেয়েছে,—ব্যাপারটা তার নিজের চোখে দেখা! দোকানদারের উপযুক্ত কাজই বটে,—এরকম চললেই খরিদ্দারে ভ'রে যাবে দোকান। দোকানে কাজ করবার সময় সে তার স্বামীকে তার কাছে ঘনিয়ে আসতেও দেয়নি কখনো। স্বামী লারিভিয়ের এরকম ব্যাপার তো ভাবতেই পারতো না। এমনি ক'রেই তো তারা দোকানটি দাঁড় করিয়াছে।

লুসিআঁ মাদাম ভ্যাভের অবাধ্য হবার ভয় রাখে, তাই মাদাম

ভ্যভে একটু পিঠ ফেরালেই সে তার বৌয়ের উদ্দেশ্যে চুম্বন নিক্ষেপ করে মাত্র! একদিন সে অবশ্যি সাহস ভরেই তাকে মনে করিয়ে দিলো যে বর-কনেকে তিনি মধুযামিনী যাপনের জন্যে কোথাও বেড়াতে যেতে দেবেন,—বিয়ের আগেই তো কথা দিয়েছেন। এই শুনে মাদাম ভ্যভে তার পাতল ওষ্ঠটি একবার ওলটালো শুধু।

"তা, একদিন বিকেলে বড়ো রাস্তাটা ধ'রে বেড়িয়ে এসো একটু!"

নবদম্পতি তা শুনে তো হাবার মতো তাকায় এ ওর মুখে।

এরপরে অঁর্তাস কিন্তু তার মাকে সত্যি সত্যি লজ্জাকর জীব ব'লে মনে করতে লাগলো। এমন কি, রাতেও সে তার নিজের স্বামীর সংগে বড়ো একটা একা থাকতে পায় না! টু শব্দ শুনলেই মাদাম ভ্যভে খালি পায়ে উঠে আসে, দোরে ঠক ঠক শব্দ ক'রে জানতে চায়, তারা সুস্থ আছে কি না। তারা সম্পূর্ণ সুস্থ-দেহ উপভোগ করছে জানালে পরেই তিনি ব'লে উঠেন:

"তা হ'লে বরং ঘুমিয়েই পড়ো···কালই তো কাউণ্টারের পেছনেই ঝিমোতে দেখবো আবার।"

এ একেবারে সহ্য-সীমার বাইরে!

লুসিঅঁা একে একে সেই অঞ্চলের সমস্ত দোকানদারদের কথা উল্লেখ করে, কোনো আত্মীয় বা বিশ্বস্ত কোনো কর্মচারীর উপর ভার রেখে সবাই তো ঘুরে আসে কিছুদিন। অনেকের কথাই বলা যায়:

কাত্‌লা ল্যাশঁ এই তো রওনা হ'য়ে গেলো। বুলভার কাছের মণিকার তার বৌকে নিয়ে বেড়াতে গেছে স্যুইজারলণ্ড। আজকাল চুনোপুঁটিরাও মাসখানেক ঘুরে আসতে পায়।

"তার মানে ব্যবসাই মাটি! বুঝলে?" —মাদাম ভ্যভে রেগে

ওঠেন, মসেঁ্যা ভ্যাভের সময়ে বছরে একটিবারমাত্র ইষ্টারের ছুটিতে বেড়াতে যেতাম, কিন্তু তাতে তো সব কিছু অশুদ্ধ হ'য়ে যেতো না। বলবো, এর ফল হবে কী? এমনি ডানা মেলে উড়বার সখ হলেই চুলোয় যাবে দোকান। হ্যাঁ, সত্যি বলছি সবি চুলোয় যাবে।"

"কিন্তু, এতো আগেরই কথা—কোথাও বেড়াতে যাবো আমরা।"—ঔর্তাস বলে—"মনে ক'রে দেখো মা, তুমিই বলেছিলে।"

"তা হয়তো বলেছি, কিন্তু সে তো বিয়ের আগে! বিয়ের আগে তো লোকে কতো কথাই ব'লে থাকে! তাতে কি হ'লো? হ্যাঁ, গা লাগিয়ে এবার খাটো দেখি একটু।"

লুসিআঁ আসন্ন বিপদ এড়াবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। তার শাশুড়ীর টুটি টিপে ধরবার জন্যই হিংস্র একটা আক্রোশ ঠেলে ওঠে তার মধ্যে। তবে ঘণ্টা দুই পরেই ফেরে সে—একেবারেই আলাদা মানুষ। মাদাম ভ্যাভের সংগে কথা বলে সে নম্র ভাষায়, ওষ্ঠের এক কোণে বাঁকিয়ে ওঠে অদ্ভুত একটি হাসি।

সন্ধ্যেবেলা ছেলেটি তার বৌকে জিজ্ঞেস করে—"নরমাণ্ডিতে বেড়াতে গেছো কখনো?"

"যাইনি সে তুমি তো জানোই।"—বলে ঔর্তাস—"বড়ো রাস্তাটা ছাড়া পা বাড়াইনি আর কোথাও!"

পরদিন পুতুলের দোকানে সে এক হৈ চৈ ব্যাপার! লুসিআঁর বাবা হলো পেয়ার বেরার, (এই অঞ্চলে সে এই নামেই পরিচিত)। একজন পাকা কর্মকার ব'লে তার নামও আছে খুব। সেদিন ভোরেই এসে এদের সংগে সে খেতে বসলো ও বলতে লাগলো—

"এই যে মাদাম ভ্যাভে, আপনার মেয়েজামাইয়ের জন্যে একটা উপহার এনেছি।"—সংগে সংগেই সে দুটো ট্রেণ-টিকেট বের ক'রে দেয়।

"কি ওটা !" —মাদাম ভ্যভে কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

"দুটো ফার্স্ট ক্লাস টিকেট—নরমাণ্ডি ভ্রমণের জন্যে।...কি হে খোকাখুকীরা, কেমন হবে বলো তো ? একটা মাস কাটিয়ে আসবে গাঁয়ের মিঠে হাওয়ায়, গাল দুটি নিয়ে আসবে গোলাপের মতো লাল টকটকে !"

মাদাম ভ্যভে কিন্তু ঘাবড়ে যায়। প্রবল আপত্তি তুলতে চায় সে ; তবে পেয়ার বেরারের সংগে ঝগড়া করতেও ইচ্ছে নেই তার। তা ছাড়া, বেরারের যেই কথা সেই কাজ। তবে, কর্মকারটি যে এক্ষণি তাদের নিয়ে যেতে চাচ্ছে ! এই কথা শুনে সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো। দুজনকে চলন্ত ট্রেণে যেতে দেখার আগে কিছুতেই পেয়ার বেরার তাদের হাতছাড়া করতে রাজি নয় !

"আচ্ছা বেশ।"—ভেতরে ভেতরে গশ গশ করতে থাকে সে— "বেশ, নিয়ে যান মেয়েকে। ভালোই হলো যা হোক, দোকানের ভেতরেই নির্লজ্জের মতো চুমো খেতে থাকবে না তো। বেশ, আমি একাই রক্ষা করতে পারবো দোকানের মর্যাদা।"

শেষ পর্যন্ত পরিণীত তরুণ-যুগল পৌছে গেলো স্যাঁ লাজার ষ্টেশনে, সংগে শ্বশুর মশাই। পেয়ার বেরারের তাড়াতাড়িতে তারা জামা-কাপড়টাও ট্রাংকে ঠিকমতো নিয়ে আসতে পারে নি। বেরার এবারে দুজনের গালেই সশব্দে চুমো খেয়ে তাদের উপদেশ দিলো সবকিছু দেখতে, বাড়ী ফিরে সবকিছুই তার কাছে বর্ণনা করতে হবে কিন্তু। শুনে ভারী মজা পাবে সে।

লুসিআঁ ও অঁতাস গাড়ির একটা খালি কামরা খুঁজে নিলো ; ভাগ্যক্রমে একটা ভালো কামরাই জুটলো তাদের। তাড়াতাড়ি ঢুকে তারা বেশ মজা ক'রে বসতেই—কি দুঃখের কথা ! চশমাপরা এক ভদ্রলোক সেই কামরাতেই উঠে ব'সে কটমট ক'রে তাদের

দিকে তাকাতে লাগলেন। ছেড়ে দিলো ট্রেণ। ব্যথিত চিত্তে ওঁর্তাস মাথা ঘুরিয়ে বাইরের বনপ্রান্তর দেখবার ভান করে, কিন্তু তার চোখ দুটি অশ্রুতে এমন ভাবে ঝাপসা হ'য়ে আসে যে বাইরের গাছগুলিও সে দেখতে পায় না। লুসিআঁ এমন একটা মতলব আঁটতে থাকে যাতে এই চশমাপরা লোকটিকে সে কোনোরকমে সরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু কোনো ফন্দীই কার্যকারী মনে হয় না।

কখনো আশা হয়—তার সংগীটি নেবে যাবে মেলঁ্য বা তার পরের ষ্টেশনেই,—কিন্তু শিগগিরি সে ভুল ভেঙে যায়। ভদ্রলোক যাবেন সোজা আভর্ পর্যন্তই। লুসিআঁ সংকল্প করে, স্ত্রীর হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নেবে; তারা তো বিবাহিতই,—প্রকাশ্যেই ভালোবাসা প্রকাশ করার অধিকার আছে তাদের। এদিকে কিন্তু ভদ্রলোকের ভুরু ক্রমেই কুঁচকে ওঠে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, প্রকাশ্যে এরকম অনুরাগ প্রকাশ অনুমোদন করেন না তিনি। কাজেই ওঁর্তাস স্বামীর হাত থেকে তার হাতটি ছাড়িয়ে নেয়। বাকী সময়টা কাটে নীরবে,—এবং বাধো বাধো একটা অস্বস্তির মধ্যে।

এবারে রুআঁতে এসে তারা বেশ শান্তি পাচ্ছে।

লুসিআঁ প্যারী থেকে আসার সময় একটা গাইড বুক কিনে এনেছিলো। এবারে তারা নামজাদা একটা হোটেলে এসে ওয়েটারদের পাল্লায় পড়লো। হোটেলের খাবার হলঘরে ব'সে তারা এ ওর সংগে কথা বলতেও সাহস পায় না,—সামনেই তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে শত শত লোক! কাজেই সকাল সকাল শুতে যায় তারা; কিন্তু ঘরের পার্টিশন এতো পাতল যে দুপাশের যাত্রীরা তাদের একটুখানি নড়াচড়াও শুনতে পায়। কাজেই তারা একটুও নড়াচড়া করতে বা গলা খাঁকারি দিতেও সাহস পায় না!

"চলো, সহরটা ঘুরে আসি একবার।" —লুসিআঁ ভোর হ'লেই ব'লে ওঠে—"তার পরেই চ'লে যাবো আভর্-এ।"

সমস্ত দিন পায়ে হেঁটে দেখলো তারা নানা জায়গা: গির্জায় দেখলো চমৎকার একটা স্তম্ভ, দেশজ সমস্ত মাখনের উপর কর বসিয়ে সেই অর্থ দ্বারাই গির্জাধ্যক্ষেরা এই স্তম্ভটি তৈরী করিয়েছেন, দেখলো ডিউক অব নরম্যাণ্ডির প্রাচীন প্রাসাদ প্লাস ঝাঁ পার্ক, যাদুঘর, এমন কি বিখ্যাত কবরভূমিও! প্রবেশ করলো প্রাচীন গির্জায়, এই গির্জাটি এখন শস্যাগারে পরিণত হয়েছে! তারা যেনো একটা কর্তব্যই সম্পাদন ক'রে যাচ্ছে—বিশেষ ক'রে অঁর্তাস তো বিরক্তই হ'য়ে উঠলো। সে এতো ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো যে পরের দিন ট্রেণেই ঘুমিয়ে পড়লো।

আভর্-এ পৌঁছে জুটলো আর এক আপদ। হোটেলের বিছানাগুলি এতো ছোটো যে দুজনের শোবার বিছানাওয়ালা ঘর খুঁজে পাওয়া ভার। অঁর্তাস নিজেকে তো অপমানিতই মনে করতে লাগলো,—কাঁদতে লাগলো সে। লুসিআঁ তাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে থাকে, ভরসা দেয় শহরটা একবার দেখেই চ'লে যাবে তারা, তার বেশী একটুও দেরী করবে না। সংগে সংগেই সুরু হ'য়ে যায় পাগলের মতো ঘুরতে থাকা।

এবারে তারা আভর্ ছেড়ে চললো। গাইডবুকে যে কয়টি বিশিষ্ট ষ্টেশনের নাম আছে সে সব জায়গায় কয়েকদিন ক'রে থাকলো তারা। একে একে তারা দেখলো—অঁফ্ল্যর, পঁলেভেক্, কাঁ, বাইয়্য, শেরবুর্গ। হাজার হাজার ষ্ট্রীট, মনুমেণ্ট ও গির্জা তাদের মাথার মধ্যে এমন ভাবে ঘুরপাক খেতে থাকে যে সমস্তই গুলিয়ে ফেলে তারা। তাদের যাত্রাপথের সামনে একে একে জেগে ওঠে নতুন নতুন এক

একটি দিগন্তরেখার রাজ্য, কিন্তু তাদের কাছে সব কিছুই এখন একান্ত অর্থহীন, বিরক্তিকর!

আসলে এখন তারা আর দেখছে না কিছুই! শুধু একটানা যাত্রা! এ যেনো একটা অপ্রিয় কর্তব্য কাজ—যা থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছে না তারা। যেহেতু রওনা হ'য়েছে ফিরে যেতে হবেই—এই হ'লো অবস্থা। শেরবুর্গে লুসিঁআর মুখ থেকে একদিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে তার মনের কথা—"আমার মনে হয় এর চেয়ে তোমার মায়ের কাছেই ভালো ছিলাম!"

পরদিনই রওনা হ'লো তারা গ্রাদভিলের দিকে। লুসিঁআ গম্ভীর মুখে ব'সে আছে,—উদভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে পল্লীর দিকে। দুপাশ দিয়ে বনাপ্রান্তর চ'লে যাচ্ছে ঘুরে ঘুরে—ঠিক ঘুরন্ত পাখার মতো। ছোট্ট একটা ষ্টেশনে এসে থামলো ট্রেণ—এ ষ্টেশনের নামও তাদের কানে এসে পৌঁছোয় না। বাইরে গাছের ফাঁক দিয়ে একদিকে ছাতছানির মতো দেখা যায় রমণীয় এক প্রান্তর।, লুসিঁআ হঠাৎ ব'লে, ওঠে—"এসো, জলদি নেমে পড়ি!"

"কিন্তু গাইড বুকে এ ষ্টেশনের নাম নেই তো।"—অঁর্তাস আপত্তি জানায়।

"গাইড বুক দিয়ে হবে কী, রাখো তোমার গাইড বুক। ওটা দিয়ে কি করি একটু পরেই দেখাচ্ছি তোমাকে। এসো, জলদি নেমে পড়ো।"

"বাঃ রে, মালপত্তর?"

"থাক না মালপত্তর!"

অঁর্তাস নেমে পড়ে,—রমণীয় প্রান্তরের এক প্রান্তে তাদের দুজনকে রেখে চ'লে যায় ট্রেণ। ষ্টেশন পেরিয়ে এসেই পড়লো তারা অবাধ

উন্মুক্ত পল্লীরাজ্যে। কোথাও নেই কোনো সোরগোল। পাখীরা গান গাইছে বনে বনে; প্রান্তরের ঢালু বুকে ব'য়ে চলেছে স্বচ্ছ-সলিলা এক নদী! যেতে যেতে লুসিআঁর প্রথম কাজই হ'লো গাইড বুকটাকে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলা। এবারে! এবারে মুক্ত তারা।

কাছেই নিভৃত একটি পল্লীসরাই। সরাই পরিচালিকা তাদের থাকতে দিলো মস্তো একটা ঘর। বসন্তের উজ্জ্বল রোদের মতো আনন্দময় সেই ঘরের আবহাওয়া। সাদা চূণকাম করা দেয়ালগুলি পুরো এক হাত চওড়া,—তা ছাড়া ঘরের পাশেই অন্য কোনো যাত্রীও নেই! মুরগীগুলি তাদের দিকে কেমন উৎসুক ভাবে তাকিয়ে থাকে শুধু!

"এই টিকেটে আরো আট দিন চলবে।"—লুসিআঁ বলে—"আটটা দিন এখানেই কাটিয়ে দেবো।"

আঃ, কী সুখের সেই দিন কটি! অচলা পথ ধ'রে বেরিয়ে পড়ে তারা খুব ভোরে, পাহাড়ের ঢালু প্রান্তরে হারিয়ে যায় বনের বুকে, সেখানেই কাটিয়ে দেয় সারাটা দিন লম্বা লম্বা ঘাসের মাঝে, উন্মাদ যৌবনের প্রণয়কে আড়াল ক'রে রাখে সবুজ ঘাসের নিবিড় পাতারা!

ছুটে চলে তারা স্রোতের সাথে পাল্লা দিয়ে, অঁর্তাস তো স্কুল-পালানো ছেলের মতোই ছুটোছুটি সুরু ক'রে দেয়; জুতো খুলে রেখে সে বনপথ ধ'রে ছুটে চলে। লুসিআঁ পেছন দিক থেকে হঠাৎ ছুটে এসে তাকে চুমো খেয়ে ছুট দেয়,—আর অঁর্তাস অস্ফুটস্বরে চীৎকার ক'রে ওঠে! পোশাকের অভাব,—সব কিছুর অভাবই তার কাছে যেনো বেশ একটা মজার ব্যাপার! এখানে এই নিরালা

দেশে কেউ তাদের খোঁজ নেবে না,—এটা ভারী মজার, ভারী আমোদের! উৎসাহে তারা অধীর হ'য়ে ওঠে।

আঁতাস অগত্যা গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে ধার চেয়ে নিয়েছে কয়েকটা আণ্ডার-উইয়ার। খসখসে মোটা কাপড়ে চামরায় সুড়সুড়ি লাগে, আর আঁতাস হেসে ওঠে খিলখিল ক'রে। তাদের ঘরটিও এমন হাসিখুসীতে ভরা! আটটা রাতেই স্তব্ধ হ'য়ে আসে পৃথিবী, তারাও ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ে!

খুব সকালে কেউ তাদের না জাগায়—এটা তাদের বিশেষ নিদেশ। কখনো কখনো লুসিঁআ পা-জামাটা প'রেই নীচ থেকে প্রাতরাশ নিয়ে আসে—ডিম, দুধ, কাটলেট, কতো কী। আর কাউকেই সে ঘরে ঢুকতে দেয় না। এইভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চমৎকার খাবার খাওয়া এবং তার চতুর্গুণ চুমো খাওয়া—সত্যি কী মজার, কী আরামের। সাত দিন পরে তারা অবাক হ'য়ে দেখে,—গোটা হপ্তাটাই উড়ে গেছে এর ভেতর। হঠাৎ তারা এসেছিলো, আর হঠাৎই চ'লে যায় একদিন। দিনগুলো যেখানে ভ'রে উঠলো ভালোবাসায় তার নামও তারা জানতে চাইলো না।

'মধুযামিনী যাপন' এবারে সত্যিই হ'লো তা হ'লে। প্যারীতে এসে তবে তারা তাদের মালপত্রের খোঁজ নেয়। পেয়ার বেরার তাদের বেড়ানোর কথা জিজ্ঞেস করলে—তারা গুলিয়ে ফেলে সব। সমুদ্র দেখেছে তারা কাঁ-তে, বিখ্যাত স্তম্ভটা হলো অভার্-এ! কর্মকার বলে—"আরে সর্বনাশ! বলছো কি সব! শেরবুর্গের কথাই বলো নি? তারপর, আর্সেনল?" লুসিঁআ ধীরে ধীরে বলে—"ও, আর্সেনল, সেখানে তো গাছপালাই নেই!"

মাদাম· ভ্যাভে এদের কথা শুনে ঘাড় কুঁচকে বিরক্তির ভংগী করে ও আপন মনে বলে—

"বেড়াতে গিয়ে কী যে লাভ? কোন কোন মনুমেণ্ট দেখলো, তাও জানে না এরা…"

"অঁর্তাস, এসো তো এদিকে, বাজে কথা যথেষ্ট বলেছো, কাউণ্টারে এসো এবার!"

জয়ঢাক বাদক

সেদিন ভোরে বাড়ীতে শুয়ে আছি,—দোরে হঠাৎ ঠক্ ঠক্ শব্দ।

"কে?"

"মস্তো বড়ো বাক্স নিয়ে একটা লোক।"

ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনো রেলওয়ে পার্শেল এসেছে, কিন্তু পার্শেলের বদলে দেখতে পেলাম বেঁটে একটি লোককে। মাথায় গোল টুপি, গায়ে প্রভাঁসীয় মেষপালকদের খাটো জ্যাকেট। শরতের সোনালি রোদে দাঁড়িয়ে আছে সে আমার সামনেই। উৎসুক চোখ দুটি শান্ত, তবে মুখের ভাব একরোখা; মোটা দুটি গোঁফে ঢেকে আছে মুখের আধখানা, কথায় ছড়াচ্ছে রসুনের গন্ধ,—সর্বত্রই রৌদ্রোজ্জ্বল দক্ষিণ দেশের আমেজ। সে বললো—

"আমিই ব্যুইসঁ।"—একটা খাম এগিয়ে দেয় সে। দেখেই চিনলাম আমি—উপরে কবি ফ্রেদারিক মিস্ত্রালের হাতে লেখা আমার নাম, কী সুন্দর সেই হাতের লেখা! সংক্ষিপ্ত চিঠি:

"বন্ধুবর, ব্যুইসঁকে পাঠাচ্ছি। জয়ঢাক বাদক সে, প্যারীতে পরিচিত হ'তে চায়। একে সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দেবে।"

পরিচয় করিয়ে দেবো একটি জয়ঢাক বাদককে! এই দোখ্ণোদের সত্যিই কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই?

চিঠিটুকু প'ড়ে ব্যুইসঁকে বললাম—

"তুমি তা হ'লে জয়ঢাকবাদক?"

"হ্যাঁ, মঁস্যো দোদে, সবার সেরা বাদক আমি, তা'তো দেখতেই পাবেন।"

সে তার বাদ্যযন্ত্রটা আনতে বাইরে গেলো, বুদ্ধিমানের মতো সেটা সে বাইরে দোরের পেছনে রেখে এসেছিলো। লম্বা একটা চ্যাপ্টা বাক্স, পশমী কাপড়ে ঢাকা মস্তো বড়ো পাইপের মতো,—ফেরিওয়ালারা যে রকম বাক্সে মিঠাই ফেরি করে। চ্যাপ্টা বাক্সটার মধ্যে র'য়েছে গ্রাম্য ধরণের একটি বাঁশী,—সেটা বেজে ওঠে—পুঁ পুঁ! আর জয়ঢাকটা গর্জে ওঠে—ড্রুম, ড্রুম! কাপড়ঢাকা পাইপটাই হ'লো জয়ঢাক। একি জয়ঢাক! সেটাকে আবরণ মুক্ত দেখে তো কান্নাই পেলো আমার। সেই কোনকালের জয়ঢাক,—যেমনি বড়ো তেমনি একটু হাত ছোঁয়ালেই সে কী বীর-গর্জন! হাসিও পায়, কান্নাও আসে। চমৎকার ওয়ালনাট কাঠে সেটা কারুকাজ করা, কালের হাতেই টিউন করা যেনো। বিচারকের মতো এক গাম্ভীর্য নিয়ে ব্যুইসঁ জয়ঢাকটা ঝুলিয়ে নেয় তার বাঁ কাঁধে, আর বাঁশীটা নেয় বাঁ হাতের তিনটি আঙুলের মাঝে (বাজাবার ভংগীটা অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনো ছবিতে দেখে থাকবে!)। ডান হাতের ছোট্ট আইভরির লাঠিটা দিয়ে সে জয়ঢাকটায় তালে তালে ঘা মারে, আর বেজে ওঠে গম্ভীর কম্পিত স্বর, গঙ্গা ফড়িং-এর উড়বার শব্দের মতো! বাঁশী বাজে—"পুঁ পুঁ", আর জয়ঢাক গর্জে ওঠে—"ড্রুম ড্রুম!" কতোদূরে প্যারী, শীতও বহু দূরে! আমি হঠাৎ যেনো চ'লে যাই সুদূর সেই প্রভাঁস-এ, নীল সায়রের তীরে, রণনদীর তীরে পপলার বীথির ছায়ায়। জানলার নীচেই বেজে উঠছে প্রভাতী সংগীত। শুনছিলাম সেই স্তবগান, দেখছিলাম সেই নাচের মহড়া: পল্লীপ্রান্তরে প্লেনগাছের পল্লবছায়ায়, উঁচু রাস্তার ধূলি-ধবল পথে, রৌদ্রতপ্ত পাহাড়প্রান্তে ল্যাভেণ্ডারের বনে পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে নাচছিলো তারা; কখনো আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে বেরিয়ে

আসছিলো আচমকা হাওয়ার মতো! জয়ঢাকবাদকটিও তালে তালে পা ফেলে এগোচ্ছিলো পিছু পিছু, আর কনুই ঝাপটাচ্ছিলো। তার প্রত্যেকটি পা ফেলার সংগে সংগেই জয়ঢাকটাও সোৎসাহে এগিয়ে যাচ্ছিলো সামনে।

একটি জয়ঢাকের বাজনার মধ্যে কতো যে স্মৃতি!

হ্যাঁ, কতো এবং আরো কতো! তুমি হয়তো তা দেখতে পাবে না, কিন্তু আমার চোখে সবি ফুটে উঠেছে ছবির মতো! একেই বলে প্রভাঁসীয় কল্পনা-লীলা! ভোর সাতটায় জ্বালানি কাঠের একটু আগুনের শিখা দেখেই উড়ে চলে এই কল্পনা। মিস্ত্রাল আমার উৎসাহ ঠিকই অনুমান করেছে।

ব্যুইসঁও উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে খুব। সে তার বাদক-জীবনের দুঃখকষ্ট ঝড়ঝাপটার কথা বলতে থাকে,—কেমন ক'রে তার বাঁশী ও জয়ঢাককে মরতে মরতেও রক্ষা করেছে সে।

কোন পাষণ্ডেরা নাকি বাঁশীর তিনটা ফুটোর জায়গায় আর দুটো যোগ ক'রে ওটার সংস্কার করতে চেয়েছিলো একবার,—বাঁশীর আবার পাঁচটা ফুটো! কী সর্বনেশে কথা! তিন ফুটোওয়ালা বাঁশীই সে আকড়ে থাকে প্রাচীন ও পবিত্র কিছুর মতো। এ বাঁশী যে তার পূর্বপুরুষদের আমলের!

"একদিন রাতে",—কেমন উৎসাহভরেই সে বিনীতভাবে বলতে লাগলো। কিন্তু তার কথায় যা গেঁয়ো টান তা'তে শোকসভার বক্তৃতাও হাস্যকর হ'য়ে ওঠা স্বাভাবিক! সে বলতে লাগলো, "গাছের তলায় বইস্যা দোয়েলের গান শুনছি আর ভাবছি—কি ব্যুইসঁ, দেখলি তো? একটা বনের পাখীও কেমন সুন্দর গান গাইছে। সে একটি মুখে যে সুর ছিষ্টি করছে তুই মানুষ হইয়া তিনটো ফুটোর মুখে তা করতে

পারবি না ?" এই মন্তব্যটা মূর্খের বাহাদুরীর মতো শোনালেও সেদিন ভোরে তা' ভারী মিষ্টিই লেগেছিলো আমার কানে।

দক্ষিণদেশী কোনো সংলোক সংগী না পেলে কোনো কিছুতেই আনন্দ পায় না। ব্যুইসঁকে খুবি প্রশংসা করলাম ; অন্যেরও মুগ্ধ হওয়া দরকার। তখন আমার অবস্থাটা ভাবুন—প্যারী শহরময় ছুটে বেড়াচ্ছি আমাদের জয়ঢাকবাদককে সংগে নিয়ে, লম্বা বিজ্ঞাপন ঝেড়ে সবাইর সংগে তাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—একটি বিশিষ্ট জনের মতোই ! বন্ধুদের পাকড়াও ক'রে আমাদের নিজের বাড়ীতে এনে গান-বাজনার ব্যবস্থা করেছি। ব্যুইসঁ বাজিয়ে চলে, বর্ণনা করে তার জীবনযুদ্ধের কাহিনী, "একদিন রাতে।" এই কথাটা ব্যবহার করতে সত্যি ভালোবাসে সে। আমার বন্ধুরাও অবশ্যি ভালো মানুষের মতো শুনে যায়, তার প্রতিভা দেখে খুবি চমৎকৃত হওয়ার ভাব দেখায়।

কিন্তু এই তো সবে সুরু ! তখন আমার রচিত একটি প্রভাঁসীয় পল্লীনাটকের রিহার্সেল চলছিলো। আমি ব্যুইসঁ, তার বাঁশী ও জয়ঢাকের তারিফ করলাম মঞ্চপরিচালক হোষ্টাইনের কাছে ;—তা সহজেই তোমরা অনুমান করতে পারো, এ জন্যে লম্বা এক বক্তৃতাও যে না ঝাড়তে হয়েছে তা নয়। পুরো আট দিন ধ'রে দিনরাত তার প্রশংসায় মুখর হ'য়ে রইলাম। শেষ পর্যন্ত হোষ্টাইন বললো, "বেশ, আপনার জয়ঢাকবাদকটিকে নাটকের মধ্যে স্থান দিলাম, কিন্তু ভাবুন তো কাণ্ডখানা একবার ! হৈ চৈ ক'রে কি আর দর্শকদের মন পাওয়া যাবে ?"

উৎসাহের চোটে এই প্রভাঁসীয় বাদকটির তো ঘুমই আসে না ! পরের দিন ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে বসলাম আমরা তিনজনে : সে, জয়ঢাকটা আর আমি। বিজ্ঞাপিত সময় সাড়ে বারোটায়ই এসে পড়লাম অসংখ্য দর্শকজনের মাঝে। অন্ধকার নীচু গলিপথে আসতে আসতে

ব্যুইস্‌ঁ বলছিলো,—"ওরে বাবা, এ কি অন্ধকার গলি। আর, যা' ঠাণ্ডা !"

এ বিষয়ে জয়ঢাকটিও একমত ! প্রবেশপথের দেয়ালে ও জানলায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সশব্দে সে আপত্তি জানাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত হুঁচোট খেতে খেতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পৌঁছলাম এসে মঞ্চে। রিহার্সেল স্থরু হ'য়ে গেছে।···অজস্র লোক, অসংখ্য জিনিষপত্তর, কতো মঞ্চচিত্র,—সব মিলে বিরাট একটা হৈ-চৈ ব্যাপার।···এসব দৃশ্য আর কোনোদিন দেখেনি তো,—আমাদের জয়ঢাকবাদকটি প্রথমে একটু ঘাব্‌ড়েই গেলো, কিন্তু শিগগিরি সামলে উঠে মঞ্চের পেছন-প্রান্তে মস্তো বড়ো একটা পিপার উপরে তার আসন গ্রহণ করলো। জয়ঢাক শুদ্ধু দৃশ্যটা হ'লো : একটা পিপার উপরে আর একটা পিপা যেনো ! বৃথাই আপত্তি তুললাম, বৃথাই বলছিলাম বারবার—"প্রভাঁসে লোক হাঁটতে হাঁটতেই বাজায়, এ রকমভাবে বাজানো অসম্ভব।"

হোষ্টাইন আমাকে নিশ্চিত ক'রে বুঝিয়ে দিলো, আমার এই বাদকটি হ'লো ভ্রাম্যমান বাদক, এবং মঞ্চে বাদকের স্থান হ'লো একমাত্র পিপার উপরেই ! বেশ, তা' হ'লে পিপাতেই বস্থক ! ব্যুইস্‌ঁও দৃঢ় বিশ্বাসে পিপাটার উপরে উঠে তাল সামলে বসবার চেষ্টা করতে করতে বলে, "ও ঠিক আছে।" কাজেই আমরা তাকে সেইভাবে রেখে বাইরে এলাম। তার মুখে বাঁশী, হাতে বাজাবার লাঠি, চারপাশে নানা মঞ্চচিত্র। মঞ্চের সামনে আমরা সবাই,—পরিচালক, গ্রন্থকার ও অভিনেতাবর্গ। দূর থেকে লক্ষ্য করছি,—কি রকম লাগছে সবাইর।

"একদিন রাতে", ব্যুইস্‌ঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "একদিন রাতে হ'লো কি আমার, একটা জলপাইগাছের তলায় বইস্যা দোয়েলের গান শুনছি······"

"বেশ, বেঁশ, আর না বল্‌লেও চলবে। আগে বাজাও।"—ওর সেই ভাষার মুদ্রাদোষ শুনেই আমি রেগে যাই।

"পুঁ—পুঁ! ড়ুম—ড়ুম!!"

"চুপ, চুপ, এই সুরু হ'চ্ছে।"

"এবারে বোঝা যাবে।"

ওরে সর্বনাশ! ঐ কোনটিতে বসে ফড়িংয়ের মতো ফর্‌ফর্‌ শব্দ ক'রে বাজাচ্ছে তার গেঁয়ো বাজনা! শুনে তো সমস্ত শ্রোতাদের সে কী অবস্থা! অভিনেতারা রসালো বিদ্রূপে ওষ্ঠ বাঁকায়, লাইট-ফিটার তো একপাশে হাস্‌তে হাস্‌তে গড়াগড়ি যায় আর কি! প্রম্‌টার তার আড়াল থেকে মুখখানা বাড়িয়ে দেয়—বিরাট এক কচ্ছপের মতো! যা' হোক, ব্যুইসঁ বাজনা শেষ ক'রে তার সেই বক্তৃতার বিশিষ্ট বাকী অংশটা সুরু করে—"কি? একটা বনের পাখীও কেমন সুন্দর গাইছে। সে একটি মুখে যে সুর ছিষ্টি করছে, তুই তিনটে মুখে তা' করতে পারবি না?"

হোষ্টাইন জিজ্ঞেস করে—"লোকটি কী সব ফুটোর কথা ব'লে যাচ্ছে?"

ব্যাপারটা আমি তখন বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করি,—পাঁচটার বদলে তিনটে ফুটো থাকা একান্তই জরুরী কেন! বুঝিয়ে বলি একই লোকের পক্ষে এক সংগে বাঁশী ও জয়ঢাক বাজানোর কৃতিত্ব! মারি লোরাঁ মন্তব্য করেন—"কিন্তু কথাটা হ'লো দুজনে দুটো বাজালেই তো আরো সুবিধে হয়।"

আমার যুক্তি জোরালো করবার জন্য নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি, কিন্তু বৃথাই। একটু একটু ক'রে করুণ সত্যটা এবারে ধরা পড়তে থাকে, এক: ঢোলবাদকের পুরোনো কায়দায় বাজনা শুনেই আমার মনে জেগে উঠেছে কতো ছবি, কতো মধুর স্মৃতি! কিন্তু প্যারী-

বাসীদের বুকেও তা জাগিয়ে তুলতে হ'লে চাই প্রভাসের সেই মধুর পরিবেশ : পাহারের চূড়া, নীল আকাশ, মিষ্টি হাওয়া !

এদিকে বাদকাটির দিকে আর মনোযোগ না দিয়ে সুরু হ'য়ে গেলো রিহার্শেল। ব্যুইসঁ ব'সে আছে নিজ আসনে, বাজনায় সবাই মুগ্ধ হ'য়েছে তার নিশ্চিত ধারণা। তার বিশ্বাস, অভিনয়ে সে অংশ নিচ্ছে। প্রথম অংকের পরে আমার নিজেরি দুঃখ হ'তে লাগলো,—লোকটা পিপার উপর ব'সে আছে সবার পেছনে।

"ব্যুইসঁ, নেমে এসো জলদি।"

"এবারে সুরু করবো ?"

হতভাগ্য ব্যুইসঁ ভেবেছে, তার বাজনা শুনে সবাই একেবারে মুগ্ধ ; সে আমাকে ষ্ট্যাম্পমারা একটা চুক্তিপত্রও দেখায়।

"না, না, আজ নয়। ওরাই তোমাকে জানাবে, কিন্তু তোমার ঢাক সামলাও আগে, সবটায় ঠোকা লেগে যা শব্দ হ'চ্ছে !" ঢাকটার জন্যে এবারে লজ্জাই লাগতে লাগলো, ভয় হ'লো কেউ যদি শুনে ফেলে ! ঘোড়ার গাড়ীতে যখন গিয়ে উঠে বসলাম, আঃ, সে কী আনন্দ ! এক সপ্তাহের মধ্যেও আমি আর থিয়েটার-মুখো হই নি।

শিগগিরি একদিন ব্যুইসঁ এসে হাজির।

"আমার সেই চুক্তির কি হ'লো ?"

"সেই চুক্তি ? ও, হ্যাঁ সেই চুক্তি ! তা' হোষ্টাইন দ্বিধা করছে,—বোঝে না সে।"

"লোকটা তো আচ্ছা বোকা !"

ভদ্র ও শান্ত মানুষ ব্যুইসঁ যে ভাবে এ কথা বললো তাতেই টের পেলাম কী ভয়ানক মারাত্মক অপরাধ করেছি আমি। আমার উৎসাহ ও প্রশংসায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে সমস্ত মাত্রাবোধ ও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে

সে। এই প্রভাঁসীয় বাদকটির ধারণা হয়েছে—সত্যি সত্যিই সে বিরাট একটা সংগীত প্রতিভা, সে আশা করছিলো যে (হায়রে, আমি যদি তাকে এই আশার ইন্ধন না জোগাতাম!) সমস্ত প্যারীই তাকে মাথায় তুলে নেবে।

পথভ্রান্ত কল্পনার যাত্রী এই জয়ঢাককে থামায় কার সাধ্য!

আমারো সাহস হচ্ছিলো না: না, না, সে হবে অযথা পাগলামি মাত্র! পণ্ডশ্রম শুধু!

ব্যুইসঁ ও এদিকে খুঁজে পেয়েছে অন্যান্য সমঝদার এবং তাঁদের মধ্যে নামজাদা কয়েকজন হ'লেন—ফেলিসিআঁ দাভিদ, তেও ফীল্ গোতিয়ে। স্বপ্নালু কবি-মন সহজেই অভিভূত হ'য়ে পড়ে, উড়ে চলে ভাব-জগতে! "পূর্বদেশে অভিযান"-এর গ্রন্থকার ও ফুলবনের সুরশিল্পী সহজেই জয়ঢাক বাজনার পরিবেশের জন্য মনে মনে রচনা ক'রে তোলে পল্লীর সেই রমণীয় প্রান্তর!

বাঁশী শুনে একজন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছে—তাঁর জন্মভূমি ত্যুরাঁস এর সমুদ্রতীর, কাদনের নিম্নভূমিতে ধ্বংসোন্মুখ সেই দালানশ্রেণী। অন্যজন ভেসে চলে আরো সুদূরে,—ঢাকের একঘেয়ে বাজনার মধ্যে জানি না কেমন ক'রে সে খুঁজে পেয়েছে স্বপ্নপুরীর মধুরজনীর কোন স্মৃতি!

ব্যুইসঁ-এর অপূর্ব প্রতিভায় হঠাৎ মেতে ওঠে তাঁরা!—প্যারীর পরিবেশে এই বাজনা কিন্তু একেবারেই বেমানান।

গোটা হপ্তা ধ'রেই সমস্ত পত্রিকায় এই বাদকের স্তুতিবাদ! সচিত্র পত্রিকাগুলিতে তার ছবির ছড়াছড়ি! বিজয়ী ভঙ্গীতে সে বীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধে ঝুলে আছে ঢাক, হাতে বাঁশী! সাফল্যে অস্থির হ'য়ে ব্যুইসঁ এই সব পত্রিকা ডজনে ডজনে কিনে এনে নিজের দেশে পাঠাতে লাগলো।

মাঝে মাঝে সে তার বিজয়বার্তা বহন ক'রে আনতো আমার কাছে। তার জন্যে কতো জায়গায় পার্টি দেওয়া হ'য়েছে, কতো সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত ধনী সমাজে পেয়েছে অভ্যর্থনা! সেখানেও সে বর্ণনা করেছে তার বিখ্যাত কাহিনী। "একদিন রাতে হ'লো কি আমার,—জলপাই গাছের তলায় বইস্যা দোয়েলের গান শুনছি।" প্রত্যহ চর্চা না থাকলে অনভ্যাসে হয়তো বিদ্যা হ্রাস পেতে পারে,—তাই আমাদের ব্যুইসঁ স্থির করলো, প্যারীর মাঝখানে তার পাঁচতলার ঘরটাতে ব'সেই বাজনার তালিম করবে।—পুঁ-পুঁ ড্রুম ড্রুম! ফলে সমস্ত কোয়ার্টারটাই চটে যায়, শান্তিভঙ্গের জন্য প্রবল আপত্তি জানায়; কিন্তু ব্যুইসঁ মেতে ওঠে আরো, চারদিকে বিস্তার করতে থাকে তার বিচিত্র বাজনা ও নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত! একদিন শেষে দারোয়ান তার ঘরের চাবী দিতে নারাজ হ'য়ে ওঠে।

ঠিক একজন সংগীত-সাধকের মতোই ব্যুইসঁ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপীল ক'রে সসম্মানে জিতে যায়। ফরাসী আইন অন্য ব্যাপারে কড়াকড়ি করলেও প্রভাঁস-এর ঢাককে সুনজরে দেখে থাকবে।

এরপরে ব্যুইসঁকে আর রোখে কে? তার নিশ্চিত ধারণা হ'লো বিরাট এক প্রতিভা সে। এক রোববারে আমি একটা আমন্ত্রণ চিঠি পেলাম: সেদিন বিকেলে সে বিখ্যাত এক কনসার্ট পার্টিতে নামছে! কর্তব্যবোধে এবং বন্ধুত্ববোধেও আমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কাজেই গেলাম,—তবে মনের মধ্যে জেগে রইলো অস্বস্তি ও কেমন একটা বিপদ-আশংকা!

চমৎকার সুন্দর একটা বাড়ী, হলঘর লোকে লোকারণ্য! আমার বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতায় খুবই কাজ হ'য়েছে দেখলাম। হল-জোড়া স্তব্ধতার মাঝে হঠাৎ ড্রপসিন উঠে গেলো। এ কি! বিস্ময়ে আমি উচ্চকণ্ঠেই

ব'লে উঠলাম—'এ কি!' পাঁচ শ' লোক ধরে এমন একটা রংগমঞ্চের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ব্যুইসঁ ও তার জয়ঢাক। তার হাতে দস্তানা, পায়ে ব্রিচেজ। তাকে দেখাচ্ছিলো লম্বা লম্বা হলদে পাওয়ালা মাকড়ের মতো! বিখ্যাত ব্যংগচিত্রকর গ্রাভিল যে রকম এঁকে থাকে। ব্যুইসঁ বাজিয়ে যাচ্ছে জোর তালে। চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম,—ব্যুইসঁ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একা, লম্বা হাত দুটো দুলিয়ে দুলিয়ে বাজাচ্ছে সে। কিন্তু শ্রোতারা শুনতে পাচ্ছে না একটি শব্দও! রংগমঞ্চেই আত্মসাৎ ক'রে ফেলেছে সমস্ত শব্দ! এতো দূর থেকে বাঁশীর ছিদ্রসংখ্যা গণনা করা অসম্ভব, শোনা অসম্ভব সেই বিখ্যাত কাহিনী: "একদিন রাতে হলো কি," অথবা "ভগবানের ছিষ্ট একটা পাখীও......!"

লজ্জায় দুঃখে আমি লাল হ'য়ে উঠলাম। আমার চারদিকে শুধু বিস্ময়গুঞ্জন। কেউ কেউ বলছিলো—"এটা আবার কোন জাতীয় ঠাট্টা?" বেরোবার দরজাগুলি একে একে বন্ধ হ'তে লাগলো, ক্রমে ক্রমে খালি হ'য়ে গেলো সমস্ত ঘর। শ্রোতারা সবাই অবশ্যি ভদ্রলোক। কোনো রকম গালিগালাজ না ক'রে তারা বাদকটিকে তার বাজনা আপনমনেই শেষ করতে দিয়েছে!

তাকে সান্ত্বনা দেবো ব'লেই ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। তা—আপনারা বিশ্বাস করবেন কি,—তার কিন্তু বিশ্বাস, বাজনার চোটে সবাইকে সে মুগ্ধ ক'রে ফেলেছে! আগের চেয়ে আরো দীপ্ত মুখে সে ব'লে উঠলো—"কলন্-এর জন্য অপেক্ষা করছি আমি। নতুন একটা চুক্তি হবে।"—এবং সংগে সংগেই সে ষ্ট্যাম্পমারা একটা কাগজ দেখালো আমাকে। ব্যাপারটা এবারে সহের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো, সাহসভরে আমি একটু কর্কশস্বরেই ব'লে ফেললাম এক নিশ্বাসেই—

"দেখো বুাইস, তোমার ঐ জয়ঢাকের মহিমা আর বাঁশীর মোহিনী স্বর সমস্ত প্যারীবাসীর কাছে প্রচার করতে যাওয়াটাই হ'য়েছে আমাদের মারাত্মক ভুল। আমি ভুল করেছি, দাভিদ ও গোতিয়েও ভুল করেছে। এবং স্বভাবতই ভুল করেছো তুমিও। না, দোয়েল নও তুমি মোটেই!"

"একদিন রাতে হ'লো কি আমার"—বুাইস বাধা দেয়।

"হ্যাঁ, তা তো বুঝলাম, একদিন রাতে তোমার কিছু হয়েছে, কিন্তু দোয়েল নও তুমি মোটেই। দোয়েল গেয়ে বেড়ায় সর্বত্র, তার গান হ'লো সব দেশের গান, সব দেশেই তার গানের আদর। তুমি হ'লে বায়স,—তোমার একঘেয়ে কর্কশ সুরের সংগে মিলিয়ে আছে ভোরের সোনালী আকাশ, উষার নরম আলো, তিমির-স্বচ্ছ বনের দৃশ্য,—সম্পূর্ণ একটি পল্লী-জগত! কিন্তু এখানে এই ধূসর আকাশের তলে, বর্ষার কাদার মধ্যে তুমি হাস্যকর একটি করুণ জীববিশেষ। কাজেই দেশে ফিরে যাও ভাই, সংগে নিয়ে যাও তোমার জয়ঢাক। সেখানে সন্ধ্যায় ভোরে গাইবে প্রেমের গান, মেয়েদের নাচের তালে বাজবে তোমার ঢাক, যুদ্ধে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানাবে জয়ঢাকের বিজয় নিনাদে। সেখানেই কবি তুমি, শিল্পী তুমি।—কিন্তু এখানে কিছুই নও,—অবহেলিত একটি গেঁয়ো বাজনদার মাত্র!"

কোনো জবাব দিলো না সে। তবে তার বিচিত্র চাউনিতে ও তার তীক্ষ্ণ চোখে ধরা পড়লো তার মনের ভাবনা :

"ও, আপনার ঈর্ষা হচ্ছে?"

কয়েকদিন পরেই অদ্ভুত এই লোকটি গর্বিত ভংগীতে এসে জানালো, হোষ্টাইনের মতো আর একটি মূর্খ হলো কলন, চুক্তিপত্রে

স্বাক্ষর করতে রাজি নয় সে। তবে, এবার আর একটা চমৎকার চুক্তি পেয়েছে সে—কাফে কনসার্টে; প্রত্যেক রাতে দেবে ১২০ ফ্রাংক, চুক্তিতে স্বাক্ষরও হ'য়ে গেছে। কাগজটা সে দেখালো আমাকে। আঃ, চমৎকার চুক্তিই বটে! ব্যাপারটা বুঝেছি আমি পরে।

জানি না কোন্ উদ্‌ভ্রান্ত প্রযোজক অন্ধের মতোই আঁকড়ে ধরেছে আমাদের এই ভাঙা ভেলাটিকে,—ব্যুইসঁ-এর করুণ বাজনাকে! লোকটি সই করেছে বটে, দেবে না আধলাটিও! কিন্তু প্রভাঁসের সরল লোক ব্যুইসঁ-এর মাথায় অতোটা ঢোকেনি, সে ষ্ট্যাম্পমারা কাগজে চুক্তি ক'রেই নিশ্চিন্ত এবং সুখী। গানের হলে পোষাকও তো পরতে পাবে।

একটি প্রাণখোলা হাসি হেসে ব'ললো সে—"আমাকে সাজিয়ে দিয়েছে তারা আগের দিনের ক্রবাদুরের মতো। তবে আমার চেহারা ভালো বলে বেশ মানিয়ে যায়, তা দেখতেই পারেন।" এবং আমি তা দেখতেই পাচ্ছিলাম।

ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের শেষের দিকের সংগীতভবন এটি বিচিত্র কারুকাজ—আধা চীনা, আধা পারসীয়। এখানকার 'বক্সে' আত্মগোপন ক'রে কতোদিন কতো রাজদূত ও রাজকন্যারা বাহবা জানিয়েছে রংগমঞ্চের অশ্লীল সংগীতের উদ্দেশে। সুন্দরী একটি মেয়ের গান চললো একটানা। রংগমঞ্চে অর্ধচন্দ্রাকারে ব'সে কয়েকটি মেয়ে হাই তুলেছিলো আর ঝিমোচ্ছিলো শুধু। হঠাৎ তাদের সামনে এসে খাড়া হলো এক ব্যক্তি। ম'রে গেলেও সে দৃশ্য ভুলবার নয়! এ যে ব্যুইসঁ!—হাতে বাঁশী, জয়ঢাকটা হাঁটুর উপরে, ক্রবাদুরের পোশাক গায়ে। সে যা শাসিয়েছে তা' তো ঠিকই! একটা লালনীল ট্রাউজার পরণে, (ভাবো ব্যাপারখানা!)—একটা পা লাল, অন্যটা নীল;

এবং সমস্ত পোশাকটাই এতো আঁটসাঁট যে দেখেই ভয় লেগে যায়। তার উপরে আবার তার মস্তো বড়ো কালো গোঁফ জোড়া চিবুকের উপর দিয়ে ঝুলে প'ড়েছে নীচে,—কালো দুটো ঝাঁটার মতোই! তার প্রিয় গোঁফ জোড়া সে কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারছে না।

এই পোশাকের অভিনবত্বে মুগ্ধ হ'য়ে দর্শকেরা দীর্ঘ প্রশংসা গুঞ্জনে অভ্যর্থনা ক'রলো আমাদের বাদকটিকে। ক্রবাদুরের মুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির হাসি,—তার সম্মুখে জনতার সহানুভূতি ও পশ্চাতে সুন্দরী মেয়েদের মদির কটাক্ষ অনুভব ক'রে সে খুশীই হ'য়ে উঠেছে। অবশ্যি বাজনা সুরু ক'রলে অবস্থাটা হ'লো একেবারেই বিপরীত। পুঁ পুঁ ও ড্রুম্ ড্রুম্ শহরের দূষিত রুচিকে তৃপ্ত করতে না পেরে হার মেনে গেলো। তা ছাড়া ভদ্র ও শিক্ষিত নয় এখানকার দর্শকেরা! "হয়েছে, বের ক'রে দাও একে। থাম ব্যাটা, পাজি কোথাকার।" ব্যুইসঁ বৃথাই বারবার ব'লতে চেষ্টা করে—"একদিন রাতে হ'লো কি—।" দর্শকেরা উঠে গেলো, নেমে এলো ড্রপসিন। আমাদের লালনীল, হ'লদে-সবুজ ক্রবাদুর হৈ-চৈ ও গালিগালাজের মাঝে রংগমঞ্চ থেকে প্রস্থান ক'রলো—একটি ঝোড়ো পাখীর মতোই।

আপনাদের কি বিশ্বাস হবে? ব্যুইসঁ জয়ঢাক ছাড়তে পারলো না। এই প্রভাঁসের লোকের মাথায় একটা ধারণা গজালে তা উপড়ে ফেলা দুরূহ ব্যাপার। পনেরটি সন্ধ্যা ক্রমাগত সে হাজির হ'তে লাগলো; অপমান পেলো যথেষ্টই কিন্তু মুদ্রা পেলো না একটিও, শেষ অবধি শেরিফ প্রেরিত এক অফিসার এসে থিয়েটারের সদর ফটকে ঝুলিয়ে দিলো নোটিশ বোর্ড—"প্রবেশ নিষেধ।"

এই থেকেই সুরু হ'লো ব্যুইসেঁর পতন। নিম্ন থেকে নিম্নতর আড্ডাখানায় সে নেমে যেতে লাগলো। অথচ নিজ সাফল্য প্রসংগে

তার দৃঢ় বিশ্বাস, নির্বিবাদেই সে স্বাক্ষর ক'রে যাচ্ছে চুক্তিপত্রে। শেষ অবধি ভিড়লো গিয়ে সে শহরতলীর চা বাগানে। সেখানে বাদকেরা পারিশ্রমিক পায় ঘণ্টা হিসেবে। অর্কেষ্ট্রা হ'লো শুধু একটা ভাঙা কাঁসর। শ্রোতারা হ'লো রোববারের আমোদে মশগুল সব মাতাল।

একদিন সন্ধ্যেবেলা,—শীত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে তখন, বসন্তও সুরু হয়নি,—আমি যাচ্ছিলাম শাঁজেলিসের পথে। একটা যাত্রা পার্টি মনোযোগ আকর্ষণ ক'রবার জন্যই একটা ন্যাড়া গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে কয়েকটা লণ্ঠন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি প'ড়ছিলো,—ঈষৎ বিষণ্ণ আবহাওয়া। হঠাৎ শুনতে পেলাম—পুঁ পুঁ! ড্রুম্ ড্রুম্!! আবারো সে-ই! এক ফাঁক দিয়ে দেখলাম, সেই ব্যুইসঁ! পাঁচ ছজন শ্রোতার সামনে প্রভাঁসীয় একটা বাজনা বাজাচ্ছে! সবাই অবশ্যি চুপ ক'রেই দাঁড়িয়েছিলো —ছাতার তলে গা বাঁচিয়ে। ভেতরে যেতে সাহস হ'লো না। ভাবলাম, সমস্ত দোষ আমারই। আমার অসাবধান উৎসাহের ফলেই তো আজ এর এই দশা! হায়রে হতভাগা ব্যুইসঁ! হায়রে আধমরা বায়স!

ফাদার গোশের সঞ্জীবনী সুরা

"এইটে খেয়ে দেখুন তো, কি রকম লাগলো ব'লবেন," গ্রাভসঁ-র পাদ্রী আমার জন্যে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে দু' আঙুল সোনালী-সবুজ, উজ্জ্বল আনন্দ-সুরা ঢাললেন,—ঠিক গর্বভরে যেমন ক'রে জহুরী মুক্তো গোণে! আমার ভেতরটা যেনো সূর্যালোকে নেয়ে উঠলো।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই হ'লো ফাদার গোশের সুরা,—আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও আনন্দের ধন," গর্বভরেই বলেন তিনি, "এটা তৈরী হয় প্রেঁমন্ত্রে-র গির্জাবাসে,—আপনার মিল থেকে মাইল দুই দূরেই। পৃথিবীর কোনো পানীয়ই এর কাছে দাঁড়াতে পারে না। আর, আপনি যদি একবার শোনেন এই সুরার কাহিনী। আচ্ছা, শুনুন তবে।"

তখন তিনি যতোদূর সম্ভব সাদাসিদেভাবে এবং একটুও বিদ্রূপের সুর না মিশিয়ে গির্জার সেই শান্ত স্তব্ধ খাবার হলঘরে ব'সে ব'লতে লাগলেন। হলঘরের চারদিকেই সুন্দর সুন্দর ছবির মেলা, একপাশে সদ্যকাচা একটা মশারি টাঙানো। ফাদার তখন একটি প্রায়-অবিশ্বাস্য কাহিনী ব'লতে সুরু ক'রলেন:

বছর বিশেক আগে পাদ্রী সম্প্রদায়ের দুর্দশার একশেষ হয়। আমরা তাঁদের হোয়াইট ফাদার (ফর্সা বাবা?) ব'লেই ডাকতাম। গির্জাবাসের দশা দেখলে সত্যিই বুক ভেঙে কান্না আসে।

নোনায় ধরা দেয়ালগুলো ধ্ব'সে প'ড়ছে এক এক করে। স্যাঁতলা পড়া গির্জাটার সর্বাংগ এমন কি থামগুলো পর্যন্ত ফেটে চৌচির

হ'য়ে আছে। আর ধ্যানমৌন ফাদারগণ সেই নিভৃত কক্ষে ব'সে কোনোরকমে দিন কাটাচ্ছেন। জানালার সার্সিগুলিতে দাগ ধ'রে ধ'রে কিম্ভূতকিমাকার হ'য়ে আছে। গির্জার সব দরজাই ভাঙা—বন্ধ ক'রবার যো নেই। আবার তার মাঝেই ঝোড়ো হাওয়া এসে গির্জার জ্বলন্ত মোমবাতিগুলো কখনো নিভিয়ে দিয়ে যায়—ঢেলে ফেলে দেয় ফাদারদের পূতবারি। জানলাগুলো ঝাপটাতে থাকে ব্যস্তভাবে। সমস্ত গির্জাটা মনে হয় যেনো একটা প্রেতভূমি। কিন্তু সব চাইতে করুণ দশা হচ্ছে গির্জার ঘণ্টা-ঘরের। ভাঙা বাসার মতোই নিঃশব্দ নীরব,—জীবনের কোনো সাড়া নেই সেখানে। একটা ঘণ্টা কিনবার মতো পয়সাও নেই ফাদারদের। তাই সকালবেলা প্রার্থনার সময় তাঁরা আর্লমণ্ড কাঠ দিয়ে ঠকঠক ক'রে কোনোরকমে ঘণ্টা বাজানোর কাজ সেরে ফেলে। কী করুণ অবস্থা তাদের, ভাবো একবার।

হায়রে হতভাগ্য ফাদারগণ! এখনো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি উৎসবের দিনে কেমন বিষণ্ণ মলিন মুখে মাথা নীচু ক'রে আস্তে আস্তে চলেছেন তাঁরা। তাঁদের শিরস্ত্রাণের সর্বাংগেই তালি দেওয়া। ফলমূল খেয়ে অতিকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন ফাদারগণ। তাঁদের পেছন পেছন আসছেন গির্জাধ্যক্ষ। গম্ভীরমুখে ধীর পদক্ষেপে এগোচ্ছেন তিনি। দিনের আলোতে লোকে যে তাঁর পোকায়-কাটা উলের টুপী ও দরিদ্র পোশাক দেখে ফেলেছে এই লজ্জায় মাথা তাঁর নিচু হ'য়ে গেছে। ধর্মপ্রাণা মহিলারা ফাদারদের এই দুর্দশা দেখে চোখের জল ফেলেন। ক্রুশচিহ্ন নিয়ে যারা যাচ্ছিলো, তারা ফাদারদের উদ্দেশ ক'রে অবজ্ঞাভরেই ব'লছিলো, "একজায়গায় এমনিভাবে প'ড়ে থাকলে দিন দিন শুকিয়েই ম'রতে হয়।"

প্রকৃতপক্ষে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ফাদারদের সবারই এখন ধারণা, গির্জার এই অন্ধ-কারা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে গরু চরানোও ঢের ভালো। একদিন এই নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনা চ'লছে; ঠিক তখনি গির্জাধ্যক্ষকে জানানো হ'লো, ব্রাদার গোশে এই সভায় যোগ দিতে ইচ্ছা করেন। আপনাদের জ্ঞাতার্থে ব'লে নিচ্ছি, এই ব্রাদার গোশে ছিলেন গির্জার পশুপালক। শুকনো চেহারার দুটো গরু নিয়েই তিনি প'ড়ে থাকতেন দিনরাত। গরু দুটো'ও গির্জার গায়ের বাড়ন্ত সবুজ ঘাস খেয়ে বেড়াতো। বো অঞ্চলের একটি মেয়েলোক বারো বছর অবধি গোশেকে লালন পালন ক'রেছে। নাম তার বের্গ পিসি। তারপর তিনি এলেন এই ফাদারদের কাছে। সেই একঘেয়ে পশুচারণ এবং প্রার্থনা স্তোত্র আওড়ানো ছাড়া আর কিছুই জানতেন না হতভাগ্য গোশে। সেই কথাই আবার নিবোধ গোশে গর্বভরে সবার কাছে ব'লতেন। তাঁর মগজে শুধু গোবর ভরা, বুদ্ধিশুদ্ধি সব ভোঁতা হ'য়ে গেছে। খুব ধার্মিক প্রকৃতির খৃষ্টান গোশে, তবে কিছুটা হাল্কা ধরণের! সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদেই তিনি খুশি, দুরূহ ধর্মশাস্ত্রের প্রতিটি নিয়মকানুন মেনে চলেন অক্ষরে অক্ষরে।

আলোচনা সভায় এসে পৌঁছুলেন গোশে—ঠিক একটি গোবেচারার মতোই। এক পা পেছনে দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন তিনি এবং সভাকে উদ্দেশ করে নমস্কার জানালেন। তাঁর সেই হাবা মুখের উপর ছাগলের দাড়ির মতো খোঁচা খোঁচা দাড়ি ও গোল গোল ঘোলাটে চোখ দুটো দেখলে যে কারো পেটে খিল ধ'রে যায়। ব্রাদার গোশের কিন্তু এসব দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই।

"শ্রদ্ধেয় ফাদারগণ," মিষ্টি গলায় ব'লছিলেন তিনি, "এ একেবারে

খাটি সত্য কথা কথা যে শূন্য কলসীই বাজে ভালো: আমার এই ভোঁতা মগজ খাটিয়ে এতদিন পরে এই দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় আবিষ্কার ক'রতে পেরেছি ব'লেই আমার বিশ্বাস। আপনারা ভেবে দেখুন এখন।

"কিভাবে, ব'লছি। আপনারা জানেন, ছোটবেলায় বেগ পিসিই আমাকে লালন পালন ক'রেছে। ভগবান তাকে মুক্তি দিন। খাওয়া দাওয়ার পর রোজ সে যতো রাজ্যের কুৎসিত গান গাইতো: তা হ'লে কী হবে! এ অঞ্চলের পাহাড় পর্বতে যত লতাপাতা আছে তা সবই ছিলো বেগ-র নখাগ্রে। চোখ বুজে ব'লে দিতে পারতো সে, কোথায় কোন গাছগাছড়া, কোথায় কোন লতাপাতা। সত্যি ব'লতে কি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বেগ পিসি একটা অপূর্ব সুরা তৈরী ক'রে যায়। পাহাড় থেকে আমরা যে সব আগাছা কেটে আনি তারই পাচ-ছ'রকমের লতাপাতা মিশিয়ে তৈরী সেই সুরা,—অদ্ভুত জিনিষ বটে! সে অনেক কাল আগের কথা। আমার মনে হয় গির্জাধ্যক্ষের সাহায্য ও মহাপ্রাণ ফাদারদের অনুমতি পেলে আমি খোঁজ-খবর ক'রে সেই অপূর্ব সুরা প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার ক'রতে সক্ষম হবো। তারপর সেগুলি বোতল ভর্তি ক'রে কেবল চড়া দামে বিক্রী করা। ব্যস, রাতারাতি বড়লোক হ'য়ে উঠবো।"

তাঁর বলা শেষ হ'তে না হ'তেই গির্জাধ্যক্ষ লাফিয়ে উঠে গোশের গলা জড়িয়ে ধ'রলেন। পাদ্রীরা তাঁর সংগে করমর্দন করছিলেন। ষ্টুয়ার্টগণ আনন্দের আতিশয্যে তাঁর ছেড়া শিরস্ত্রাণটার উপরেই চুমু খান বারবার। তারপর সবাই নিজ নিজ জায়গায় এসে ব'সে ব্যাপারটা চিন্তা ক'রতে লাগলেন এবং সেই সভায় ব'সেই এই

সিদ্ধান্ত হ'লো, আজ থেকে গোচারণের ভার দেওয়া হবে ব্রাদার ব্রাসিব্যুল-এর উপর। এদিকে ব্রাদার গোশে এই অপূর্ব সুরা প্রস্তুত প্রণালী আবিস্কারের কাজেই সর্বদা ব্যাপৃত থাকবেন।

কি ক'রে গোশে এই সুরা প্রস্তুত প্রণালী আবিস্কার ক'রলেন? এর পেছনে ছিলো তাঁর কতো অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসীম যত্ন? ইতিহাস যদিও তা আমাদের বলে না, তবে এটাও নিছক সত্যি কথা যে মাস ছয়েক পরে গোশের এই সঞ্জীবনী সুরা সকলেরই প্রিয় সামগ্রী হ'য়ে উঠলো! সমস্ত আর্ল-অঞ্চলে এমন একটি কারখানা বা ভাঁটিখানা ছিলো না যেখানে হয়নি এই অপূর্ব সুরাভর্তি বোতলের উজ্জ্বল আবির্ভাব, বোতলের গায়ে আঁটা হয়নি রূপোলী লেবেল। পাশেই নেশায় ঢুলুঢুলু চোখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন এক পাদ্রী। সঞ্জীবনী সুরার জনপ্রিয়তা দিন দিন এমন বর্ধিত হ'তে লাগলো যে শিগগিরি ফাদারেরা এই সুরা বিক্রী ক'রে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় ক'রলেন। গির্জাবাস আবার নতুন ক'রে তৈরী করা হ'লো। গির্জাধ্যক্ষ নতুন টুপী কিনলেন, ঝকমক ক'রে উঠলো কারুকাজ করা কাচের সার্সিগুলি। সকালবেলা প্রার্থনার সময় পেতলের ঘণ্টাগুলি ঢং ঢং ক'রে বেজে উঠলো, ভারী মিষ্টি শোনাচ্ছিলো সেই ধাতব ধ্বনি।

এখন থেকে গির্জায় আর ব্রাদার গোশে ব'লে কারুর নাম শোনা যায় না। তাঁর নাম হ'য়েছে রেভারেণ্ড ফাদার গোশে, সকলে তাঁকে মস্তো বড়ো একজন প্রতিভাশালী লোক ব'লে শ্রদ্ধা করে। গির্জার তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি গা মাখেন না মোটেই, মদ চোলোইয়ের কারখানায় ব'সে দিনভর কর্তব্যব্রত উদ্‌যাপন করেন শুধু। আর তাঁর ফরমাশ অনুযায়ী সুগন্ধি লতাগুল্ম কুড়িয়ে আনবার জন্যে ত্রিশজন পাদ্রী ঘুরে বেড়ান পাহাড়ে পাহাড়ে। চোলাইয়ের কারখানাটা গির্জাসংলগ্ন

বাগানের এককোণে অবস্থিত। একটা পুরোণো পরিত্যক্ত মন্দির বিশেষ, কারোই সেখানে প্রবেশাধিকার নেই—এমন কি গির্জাধ্যক্ষেরও নয়। চৌকাঠে পা দিতে না দিতেই সভয়ে ফিরে আসতো সবাই। রোলার হাতে যাদুকর ফাদার গোশের সে কী ভয়ংকর চাউনি।

সন্ধ্যেবেলা ঘণ্টা প'ড়লে তবে ফাদারের সেই রহস্যময় কারখানার দোর আস্তে আস্তে খুলে যায়; ফাদারও সান্ধ্য প্রার্থনার জন্যে গির্জায় গিয়ে হাজির হন। গির্জার ভেতরে যাবার সময় সে কী বিপুল সম্বর্ধনা। সামনেই পেতে দেওয়া হয় প্রশস্ত গালিচা। ব্রাদারগণ দুই সারিতে বিভক্ত হ'য়ে স'রে দাঁড়ান, গোশেকে যাবার পথ ক'রে দেন। তাঁরা পরস্পর বলাবলি ক'রতে থাকেন, "চুপ, চুপ, উনিই জানেন গোপনমন্ত্র!"

ষ্টুয়ার্টগণ সারি বেঁধে ফাদার গোশের পেছনে পেছন চ'লতে থাকেন, মাথা নীচু ক'রে বিনীতভাবে তাঁর সংগে কথা বলেন। এতসব স্তুতিবাদের মাঝেও ফাদার সোজা এগিয়ে চ'লেছেন।

"এ সবকিছুর জন্যেই তো এঁরা আমার কাছে ঋণী—চিরকৃতজ্ঞ", ফাদার মনে মনে ভাবেন আর গর্বে ফুলে ওঠে তাঁর বুক।

আর, বৃদ্ধ গোশে এজন্যে সমুচিত শাস্তিও পান।

ব্যাপারটা ভেবে দেখুন একবার। সান্ধ্য প্রার্থনা চ'লছে, এমনি সময় ভয়ানক উত্তেজিত অবস্থায় গির্জার মধ্যে এসে ঢুকলেন গোশে; সারা মুখ লাল হ'য়ে গেছে, হাঁপাচ্ছেন ফাদার। তিনি এত বিচলিত হয়ে উঠেছেন যে পূতবারির কমণ্ডলুটা তুলতে গিয়ে ভিজিয়ে ফেললেন নিজের জামাটাই। সবাই ভাবলো, গির্জায় পৌছুতে দেরী হ'য়েছে ব'লেই তিনি এরকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু না, তারা দেখলো যীশুকে প্রণাম না ক'রে সাধারণ দর্শকদের প্রতি ফাদার গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন ক'রছেন,—এক ঝাপটা দমকা বাতাসের মতোই

ঘরে ঢুকে তিনি চারদিকে ছুটোছুটি ক'রছেন, গায়কদের চারপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে নিজের জায়গাটা খুঁজছেন এবং হঠাৎ একটা পাক খেয়ে ধপ ক'রে ব'সে প'ড়ে পাগোলের মতো ডানে বামে প্রণাম ক'রতে লাগলেন। এসব দেখেই বিস্ময়ে সাধারণের মধ্য থেকে একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি জেগে ওঠে! ফাদারেরা কানাকানি ক'রতে থাকেন : কি হ'লো আমাদের গোশে-র, কি হ'লো ফাদার গোশে-র?

বিরক্তিভরে গির্জাধ্যক্ষ দু'দুবার ইঙ্গিতে জানালেন, "দয়া ক'রে আপনারা সবাই চুপ করুন।" গায়কদল গান ধরলো। কিন্তু কার কথা কে শোনে? গুঞ্জন সমানেই চ'লেছে।

হঠাৎ এর মাঝখানটায় ফাদার গোশে চেয়ারের পেছনে ঝুঁকে প'ড়ে বজ্রনিনাদে গেয়ে ওঠেন :

প্যারী শহরের বুকে
হোয়াইট ফাদার আছে সুখে।
তাইরে নাইরে নাইরে না।

সংগে সংগে সোরগোল শুরু হ'লো। সবাই নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে উঠে পড়লো।

"বের ক'রে দাও লোকটাকে—ভূতে পেয়েছে ওকে", সকলে চীৎকার ক'রে ওঠে, পাদ্রীরা যীশুর নাম করেন; রাগে গির্জাধ্যক্ষের সর্বাংগ কাঁপতে থাকে। ফাদার গোশের এদিকে কিন্তু বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। অবশেষে গুণ্ডামার্কা দুজন বলদৃপ্ত পাদ্রী এসে গির্জার সামনের দোর দিয়ে ফাদার গোশেকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এলেন অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর।

পরের দিন প্রত্যূষে হতভাগা গোশে গির্জাধ্যক্ষের প্রার্থনাগৃহে নতজানু হ'য়ে সাশ্রুনয়নে তাঁর কৃতকর্মের জন্য অপরাধ স্বীকার ক'রলেন।

"সুরার নেশাই, ফাদার, সুরার নেশাই আমার মাথা

দেয়।" বুক চাপড়ে গোশে ব'লছিলেন। তার বুকভাঙা কাতরোক্তি শুনে সহৃদয় গির্জাধ্যক্ষেরও করুণা হয়।

"শুনুন ফাদার গোশে, প্রকৃতিস্থ হন আপনি। যা হ'য়ে গেছে তার জন্য আর মন খারাপ ক'রে লাভ নেই। কালই সব ধুয়ে মুছে ঠিক হ'য়ে যাবে; রোদ উঠলে আর শিশিরের দাগ থাকে না। তা'হলেও আপনি যতটা ভাবছেন, অতটা খারাপ কথা কিন্তু কেউউ আপনাকে বলেনি। হাঁা, তাদের কথাবার্তা একটু 'ইয়ে'ই হ'য়েছিলো বটে, তা' আপনি ঘাবড়াবেন না, অন্য কেউ শুনতে পায়নি। এখন খুলে বলুন দেখি আপনার ব্যাপারটা! সঞ্জীবনী সুরা চেখে দেখছিলেন তখনই বুঝি আপনার মাথাটা কি রকম হ'য়ে গেলো, তাই না? হাঁা, হাঁা, বুঝতে পারছি। নিজের ফাঁদে নিজেই আটকা প'ড়ে গিয়েছলেন আপনি। সত্যি ক'রে বলুন দেখি, এ হেন ভয়ানক সঞ্জীবনী সুরা নিজের উপরে প্রয়োগ ক'রে দেখাটা কি এমনই দরকার ছিলো?"

"কপাল খারাপ, তা না হ'লে আর এরকম হবে কেন ফাদার? সুরা প্রস্তুত করার পরীক্ষানল দেখেই অবিশ্যি বুঝতে পারি, সুরার উত্তাপ ঠিক হ'য়েছে কিনা আর কড়া পাক হ'য়েছে কিনা। কিন্তু এতে সুরার মূল মাধুর্য ঠিক ধরা পড়ে না। কাজেই নিজেকে চেখে দেখতে হয়।"

"সে তো ভালো কথা। এখন আমার বক্তব্যটা শুনুন একবার। কর্তব্যবোধ থেকেই যখন আপনি সুরা চেখে দেখেন তখন ওর প্রকৃত মাধুর্যটা কি আপনার কাছে ধরা পড়ে? বেশ উপভোগ্য ব'লে মনে হয় সুরাটি?"

"দুঃখের কথা ফাদার," হতভাগ্য গোশে-র মুখ ঈষৎ লাল হ'য়ে

ওঠে, "গত দু'দিন থেকে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, সুরার মাধুর্য দিন দিন যেনো আরো বেড়ে উঠছে। নিশ্চয়ই কোনো শয়তানের কারসাজি র'য়েছে এর মধ্যে। কই, আগে তো সুরার এমন অদ্ভুত স্বাদ, এমন অপূর্ব মায়া ছিলো না কখনো। কাজেই ঠিক ক'রেছি, এখন থেকে নিজে না চেখে দেখে পরীক্ষানলেই সুরা পরীক্ষা ক'রে দেখবো। তা'তে সুরা যদি আগের মতো অতো ভালো না হয় তা' কি করা যাবে?"

"ও ব্যবস্থা ক'রবেন না ফাদার," গির্জাধ্যক্ষ মিনতির সুরে বলেন, "খদ্দেরদের কেন আমরা অখুশি ক'রবো? তার চেয়ে আপনি বরং নিজেকে সামনে চলুন, তা'হলেই সব ঠিক হবে। এখন বলুন দেখি, দৈনিক কতটুকু 'ইয়ে' মানে সু—রা হ'লে আপনার চলে? পনেরো কি বিশ ফোঁটা, তাই নয়? বেশ, বিশ ফোঁটাই হবে। বিশ ফোঁটাতেই যদি আপনার নেশা হয়, তবে তো শয়তানের মস্তো কৃতিত্ব স্বীকার ক'রতেই হবে। উপরন্তু ভবিষ্যতে কোনো রকম দুর্ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্যে এখন থেকে আপনার গির্জায় না না এলেও চ'লবে। সুরার কারখানায় ব'সে ব'সেই প্রার্থনামন্ত্র আওড়াবেন। এখন নিশ্চিন্তমনে চ'লে যান ফাদার, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। মহাশান্তিতে ব'সে সুরার ফোঁটা কাটতে থাকুন—ঠিক বিশ ফোঁটা প'ড়লো কিনা গুণে গুণে দেখুন।"

কিন্তু হায়, বৃথাই ফাদারের ফোঁটা গোণা; নেশার ভূত তাঁকে ভালো ভাবেই পেয়ে বসে, ফাদারও নাছোড়বান্দা!

কয়েকদিন পরেই শোনা গেলো এক অদ্ভুত কাহিনী।

দিনের বেলাটা ফাদারের নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটে যায়। সাজসরঞ্জাম ধুয়ে পুছে রাখেন, সযত্নে গুছিয়ে রাখেন যতো রাজ্যের বুনো গাছ

গাছড়াগুলি। কতো রং বেরংয়ের সব লতাগুল্ম : কোনোটো হলুদ, কোনোটা ধূসর, কেউ ছড়িয়ে দিচ্ছে বুনো মিষ্টি গন্ধ, কেউ বা রোদে পুড়ে পুড়ে হ'য়ে আছে কংকালসার। কিন্তু রাতে সেইগুলিই মিশে একাকার হ'য়ে উজ্জ্বল সুরার রূপ ধারণ করে এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে সেই সঞ্জীবনী সুরা। তখন আর গোশে নিজেকে সামলে রাখতে পারেন না, সুরু হয় তাঁর 'আত্মবিসর্জন'-এর পালা।

"সতেরো, আঠেরো, উনিশ, এই বিশ।"

পরীক্ষানলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ফোঁটা ফোঁটা রূপোলী সুরা। ফাদার এক চুমুকেই সাবাড় ক'রে দেন সেই বিশ ফোঁটা। কিন্তু জিভেও লাগে না যে! একুশ ফোটা গলাধঃকরণ ক'রে তাঁর তৃষ্ণা আরও ঠেলে ওঠে। ওঃ, কী মারাত্মক এই একবিংশতিতম বিন্দু! লোভ সংবরণ করার উদ্দেশ্যে ফাদার তাড়াতাড়ি কারখানার এককোণে ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সলেন—আত্মহারা হ'য়ে রইলেন বিভোর প্রার্থনায়। কিন্তু এদিকে সেই ঈষদুষ্ণ সুরা থেকে উঠতে থাকে ধুঁয়ো। সাপের ফণার মতো দুলে দুলে উপরে উঠে একটুপরেই ভেঙে পড়ে থরে থরে,—মিলিয়ে যায় হাওয়ায়, ক্ষণেকের জন্যে দেয়ালের গায়ে রেখে যায় শুধু কালো কালো গোলাকার ছাপ। আর ওই ধুঁয়োই ব'য়ে নিয়ে আসে সুরার তীব্র গন্ধ। এই গন্ধমিশ্রিত ধুঁয়োর কুণ্ডলী ধীরে ধীরে এসে ফাদার গোশেকে যেনো মায়াজালে ঢেকে ফেলে,—তাঁকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে আসে সুরার পাত্রের উপরে। পাত্রের মধ্যে টলমল ক'রছে কাঁচা সোনা, আর তার ভেতর থেকে মাঝে মাঝে ঝিলমিল ক'রে উঠছে সবুজ আভা। গোশে-র নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে। তিনি সুরার পাত্রের উপর ঝুঁকে প'ড়ে পরীক্ষানল দিয়ে অতি সন্তর্পণে সুরা নাড়তে থাকেন। ওই স্ফটিক সরোবরের বুকের উপরে ঝলমল

ক'রতে থাকে ছোট ছোট বুদ্বুদ, আর তার মনে হয়, বেগঁপিসি তাঁর দিকে চেয়ে খুশিভরে চোখ পিট্‌পিট্ ক'রছে !"

আচ্ছা বোকা আমি ! আর এক ফোঁটা ক'রে হতভাগ্য ফাদার শেষ অবধি কানায় ভর্তি করেন তাঁর পিয়ালা। তারপর ধরণীতলে পপাত হবার আগেই গা এলিয়ে দেন একটা আরাম কেদারায়। সমস্ত শরীর শিথিল হ'য়ে আসছে, রক্তাভ চোখ ছুটি আধো বোজা। পান-পাত্রের প্রতিটি চুমুকে ফাদার নিজের অধঃপতনের পরিধি উপভোগ ক'রতে থাকেন আর বিনিয়ে বিনিয়ে আপশোষ করেন—

"আঃ, নিজেকে জাহান্নামে নিয়ে চ'লেছি, কোন জাহান্নমে !"

শয়তানের প্রভাবেই হোক আর যেমন ক'রেই হোক, এতো নেশার মাঝেও ফাদারের স্পষ্ট মনে প'ড়ছে বেগঁপিসির অশ্লীল গান !

পরের দিন প্রতিবেশীরা বক্র হাসি হেসে গোশে-কে এটা সেটা নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রতে লাগলো। ফাদার তখন কি রকম বিব্রত হ'য়ে প'ড়লেন, একবার ভেবে দেখো।

"হাঃ, হাঃ, ফাদার গোশে, কাল রাতে শুতে যাওয়ার সময় তোমার মাথায় পোকা ঢুকে গিয়েছিলো, না ?"

তারপরই শুরু হ'লো ফাদার গোশে-র কান্নাকাটি আর হা-হুতাশ। কিন্তু কোনো কিছুই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না নেশার ভূতকে,—প্রতি সন্ধ্যায়ই চড়াও হয় সে ফাদারের উপরে।

এদিকে ইতিমধ্যে গির্জায় এসে স্তূপীকৃত হ'তে থাকে অর্ডারের গাদা—সে যেনো ভগবানেরই মংগলময় আশীর্বাদ ! নীম্, একস্, আভিঞঁ, মার্সেই কতো দূরদূরান্ত থেকে লোকে চেয়ে পাঠাচ্ছে ফাদারের সঞ্জীবনী সুরা। মস্তো কারখানার মতোই গির্জাবাসের আয়তন দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগলো। প্যাক-করা, লেবেল আঁটা, চিঠি পত্রের উত্তর দেওয়া—এই

সব কাজে দলে দলে নিযুক্ত হ'তে লাগলো গির্জার ব্রাদারগণ। তার ফলে যীশুর প্রতি কর্তব্যকর্মে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে বটে, কিন্তু তাতে যে দরিদ্র গ্রামবাসীদের একটুও ক্ষতি হয়নি—এ আমি হলফ ক'রে ব'লতে পারি।

তারপরে, রবিবারের এক শুভ প্রভাতে ষ্টুয়ার্টগণ গির্জার ফাদারদের সুরার অর্ডারের তালিকা প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন, উন্মুখ আগ্রহে, ঈষৎ হাসিমুখে শুনছিলেন তাঁরা, এমন সময় আলোচনা সভায় ঝড়ের মতো এসে ঢুকলেন ফাদার গোশে।

"সব শেষ হ'য়েছে আমার, সব! আর পারি নে!" পাগোলের মতো গোশে ব'লছিলেন, "আগের মতো গরু চরাবো সেই আমার ভালো; ফিরিয়ে দাও আমার সেই গরু ছাগল।"

"কি হ'য়েছে আপনার, ফাদার গোশে?" গির্জাধ্যক্ষ জিজ্ঞেস করেন। কি যে হ'তে পারে তা তিনি কিন্তু ভালোভাবেই জানেন।

"কি হ'য়েছে জিজ্ঞেস ক'রছেন, ফাদার? হ'য়েছে এই যে সদাসর্বদা আমার প্রাণের মধ্যে জ্ব'লছে নরকের আগুন আর সেই আগুনে আমি দিবানিশি পুড়ে ম'রছি। হ'য়েছে এই যে মদ খেয়ে খেয়ে আমার বুকের ভেতরটা খাঁচা হ'য়ে গেছে—একেবারে খাঁচা।"

"কিন্তু আমি তো আপনাকে ফোঁটা গুণে নিতে ব'লেছিলাম!"

"ফোঁটা গুণে! হ্যাঁ, তাই তো! আজ আমার এতোদূর উন্নতি হ'য়েছে যে এখন আর ধারা না হ'লে চলে না! প্রতি সন্ধ্যায় তিন বোতল! বুঝতেই পারেন, এরকম ব্যবস্থা বেশীদিন টিঁকতে পারে না কখনো! কাজেই, আর যাকে খুশি তাকে দিয়েই সুরা তৈরী করান গে, আমি ওর মধ্যে নেই। ফের এই সুরা স্পর্শ করি তো নরকের আগুনে আমি যেনো জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাই।"

এবারে কিন্তু আলোচনা সভা আর আগের মতো হাসিতে ফেটে পড়ে না।

"কিন্তু ফাদার, আপনি যে আমাদেরও সর্বনাশ ক'রছেন।" হাতের তালিকা-পুস্তকখানা দোলাতে দোলাতে ষ্টুয়ার্ট চীৎকার ক'রে উঠেন।

"তা হ'লে চিরদিনের জন্যে আমি জাহান্নামে যাবো এই কি আপনারা চান ?"

গির্জাধ্যক্ষ এবারে উঠে দাঁড়ালেন।

"ফাদারগণ," ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ব'লছিলেন তিনি, হাতের আঙুলে জ্বলজ্বল ক'রছে একটা আংটি। "এইভাবেই সব ব্যবস্থা হ'তে পারে। রাতের বেলায়ই আপনাকে নেশার ভূতে পেয়ে বসে, তাই না ফাদার গোশে ?"

"হ্যাঁ ফাদার, রোজ সন্ধ্যেবেলায় রাত হ'য়ে এলে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারি না।"

"তা ভালো! শান্ত হউন ফাদার। আজ থেকে প্রতিদিন প্রার্থনায় সময় আমরা আপনার মুক্তি কামনায় সাধু ওগ্যস্তীনের নাম ক'রবো! আর হোক না কেন নরকের আগুন আর আপনাকে স্পর্শ ক'রতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত! এই প্রার্থনা পাপ থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেবে।"

"বেশ, বেশ। তা হ'লে আপনাকে ধন্যবাদ ফাদার।"

এবং আর কোনো কথা জিজ্ঞেস না ক'রে গোশে নীরবে তাঁর সুরা-পরীক্ষাগারে ফিরে গেলেন। আজ তাঁর মন থেকে এতোদিনের দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেছে,—পাপের হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছেন ফাদার গোশে।

সত্যি কথা ব'লতে কি, সেদিন থেকে আর কখনো সান্ধ্য প্রার্থনার শেষে গির্জাধ্যক্ষ ব'লতে ভুলে যেতেন না—

"হে ত্রাণকর্তা যীশু প্রভো! আজীবন পরহিতে রত হতভাগ্য ফাদার গোশে-র মঙ্গল কামনায় আমরা প্রার্থনা জানাইতেছি; তাঁহার কল্যাণ কর।"

প্রার্থনার শেষ ক্ষীণ রেশটুকু দেয়ালের গায়ে ঘা খেয়ে খেয়ে মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। ওদিকে তখন স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে, জানলার পেছনে সুরা পরীক্ষাগারে ফাদার গোশে গলা ফাটিয়ে গেয়ে চ'লেছেন—

প্যারী শহরের বুকে,
হোয়াইট ফাদার আছে সুখে,
তাইরে নাইরে না, নাইরে নাইরে না।
প্যারী শহরের মাঝে
হোয়াইট ফাদার সুখে আছে,
গির্জার মেয়েদের নিয়ে সে নাচে!
তাক ডুমা ডুম্ ডুম্, ডুডুম্ ডুডুম্ ডুম্।

এখানে এসে গ্রাভর্স-র পাদ্রী গভীর হতাশার সুরে কাহিনীটা সমাপ্ত ক'রলেন। "হায়রে ভগবান!" ব'লে ওঠেন তিনি, "ভাবুন তো একবার, এই ব্যাপারটা যদি শুনে ফেলতো সবাই!"